চতুর্থ অধ্যায়

মেঘালয়ের সাময়িক পত্র-পত্রিকা : ঐশ্বর্য পর্ব (১৯৭০-২০১০)

এই পর্বের কালসীমা চল্লিশ বছর। আলোচ্য এই পর্বে একদিকে যেমন রয়েছে মেঘালয়ের পত্র-পত্রিকাও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের ঐশ্বর্যমন্ডিত দিক, ঠিক তেমনি রয়েছে এর বেদনাবিধুর অবক্ষয়ের ইতিহাস। তবে এই পর্বই সবচাইতে বেশি দেখেছে মেঘালয়ের বাংলা ভাষা তথা বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল দিন । এই পর্বেই মেঘালয় স্বকীয় শাসন লাভ করে ভারতের ২২তম রাজ্যের মহিমা লাভ করেছিল। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার তান্ডব ঝড়ে সোনার শিলং-কে ত্যাগ করে যাওয়া অনুপজাতির নীরব সাক্ষীও এই পর্ব।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পর্বের শুরুতেই হয়েছিল 'কাব্য আন্দোলন' । যে কাব্য আন্দোলনের ধারা উন্মেষ পর্বে নবজাত ছিল তাই পূর্ণ যৌবনের উন্মাদনায় অধীর করে তুলেছিল ভারতের এই প্রান্ত অঞ্চলের সমস্ত কবিকূলকে। আর তাদের এই সম্মিলিত ভাবনার পালে জোর হাওয়া লাগিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো বরেণ্য মানুষের শিলং এ উজ্জ্বল উপস্থিতি। মেঘালয়ে তথা সমস্ত আসামে যিনি এই কাব্য আন্দোলনের ঢেউ নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নাম শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। তিনি পেশাগত দিক থেকে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু মূলত ছিলেন 'সম্পূর্ণ কবি'। উন্মেষ পর্বে সাইক্লোষ্টাইল করে কবিতা পত্র 'উৎস' প্রথম তিনিই প্রকাশ করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পরবাসী' প্রকাশিত হয়ে তাঁকে 'পঞ্চাশের কবি' হিসাবে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যে। কলকাতার কবিকুলের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট নাম। তার রচিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্র' কবিতাটি প্রথম 'সাহিত্যে'

প্রকাশিত হয় এবং পরে তার এই শিরোনামে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিদের কাব্যসংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়। শিলং থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কিছু বলিষ্ঠ কবি --- রমানাথ ভট্টাচার্য, পীযূষ ধর, মৃণাল বসু চৌধুরী (যিনি মূলতঃ কবিই ছিলেন চাকুরী সূত্রে শিলং আসেন ও দেশান্তর পত্রিকা প্রকাশ করেন), শংকর চক্রবর্তী, বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য (পরবর্তীতে তিনি হাইলাকান্দি চলে যান ও আজ তিনি সুপরিচিত 'সাহিত্য' পত্রিকার কর্ণধার), কমল সাহা, বিশ্বজিৎ নন্দী ইত্যাদি বিখ্যাত কবিরা। কাব্যচর্চার জন্য এদের নামশুধু আসামেই নয়, সমস্ত বাংলায়ই আজ সুপরিচিত। এদের মধে অনেকেই বিভিন্ন সময় নিজের রচনার জন্য পুরষ্কৃত হয়েছেন । কবি বিশ্বজিৎ নন্দী বাংলাদেশেও সম্মানিত হয়েছেন তাঁর কাব্য রচনার জন্য।

গদ্য সাহিত্যে দেখা যায় নব নব বিকাশ। গল্পের বিষয় দারুণভাবে বদলে যাচ্ছে । সমাজের পরিবর্তনের সাথে হাত মিলিয়ে চলেছে গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য। দেখা যাচ্ছে 'অণুগল্পের' অণুপ্রবেশ। তবে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই পর্ব যেন কিছুটা ম্রিয়মান অথবা বলা চলে প্রবন্ধের প্রচলিত ধারাতে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মনোজ্ঞ বিষয় নিয়ে গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধ প্রায় দেখাই যায় না। যা কিছু প্রবন্ধ রয়েছে তাকে প্রবন্ধ না বলে রচনা বললে অত্যুক্তি হয় না। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সমসাময়িক বিষয় যখন প্রবন্ধের বিষয় হয়েউঠে তখন অভিনিবেশ সহকারে মননিষ্ট প্রবন্ধ রচনা বোধকরি সম্ভবও হয়েউঠে না। 'যা দেখি তাই লিখি' --- সাহিত্যে এর প্রাদুর্ভাবই প্রকট হয়েউঠে। কিন্তু তা বলে সুসংবদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ যে রচিত হয়নি, এমন কিন্তু একেবারেই নয়। যথেষ্ঠ উঁচু মান সম্পন্ন বিশিষ্ট প্রবন্ধরাজি এই পর্বের পত্রিকা সমূহে রয়েছে। সাহিত্যের সমস্ত দিকই বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে ।

আর শুধু সাহিত্যই কেন? সাংস্কৃতিক জগতেও হয়েছে বিস্তর প্রসার ও পরিবর্তন। বিশেষতঃ নাটকের ক্ষেত্রে উন্মেষ যুগের সেই সমস্ত প্রচেষ্ঠার সফল ফলশ্রুতি দেখা যায় এই

পর্বে। নাটকের ক্ষেত্রে এই পর্বকে 'স্বর্ণ যুগ' আখ্যায় ভূষিত করা চলে। নাচ-গান-বাজনার ঐকতান এই পর্বের 'ঐশ্বর্য'-তে জুড়েছে হীরার দ্যুতি। যদিও একই সাথে একথা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে, 'স্বর্ণযুগের' রোশনাই এর চমক আজ স্তিমিত। মেঘালয়ের পর্যুদস্ত বাঙালির জীবনে ভাঙ্গনের গানই আজ বাকী রয়ে গেছে । তবুও সাম্প্রতিক কালের বৈশিষ্ট্যও পত্রিকাগুলির আলোচনার মাধ্যমেই অবগত হতে পারা যাচ্ছে ।

মল্লার (১৯৭০ জুন)

নান্টু চক্রবর্তীর সম্পাদনায় একটি মিনি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার নাম ছিল মল্লার। সম্পাদক নিজের নামের পরিবর্তে পত্রিকাটিতে লিখেছিলেন 'নন্দী ও ভৃঙ্গী'। কিন্তু মল্লারে সাহিত্যিক মান কতটা রক্ষিত হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে। যদিও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে প্রথম 'মিনি মাসিক পত্রিকা'র প্রচেষ্টা হিসাবে পত্রিকাটি প্রশংসার্হ। এই পত্রিকা থেকে, শিলঙের সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে যে উদ্যম ও পরীক্ষা নিরিক্ষার একটা চেষ্টা চলেছিল তার আভাস অবশ্যই মেলে ।

মিনি কবিতা গুচ্ছ, মিনি কাহিনি, মিনি ডাক্তারী, মিনি নার্সারী ও মিনি বিজ্ঞাপন নিয়ে এককথায় পত্রিকাটি বেশ পাঠ সুখকর।

প্রাঙ্গন

মল্লার এর সমসাময়িক আরো একটি মিনি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। যার নাম ছিল প্রাঙ্গন। পত্রিকাটির বিশেষত্ব যা ছিল তা পত্রিকাটির উপরেই বেশ জোরালো লেখায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। লেখাটি হল 'প্রথম মহিলা মিনি পত্রিকা'। সম্পাদিকা ছিলেন মল্লিকা চৌধুরী। সত্তরের দশকে শিলঙের সাহিত্যে যে জোয়ার এসেছিল, সেটা থেকে দূরে থাকেননি মহিলারাও ।

সাহিত্যের দরজায় তারাও করেছেন করাঘাত। মল্লারের মতো এই পত্রিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণগত মান সম্পর্কে ভিন্ন অভিমত থাকলেও প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় থাকে না।

দেশান্তর (১৯৭১ জুন)

সম্পাদকীয়তেই রয়েছে কাব্যিক মূর্চ্ছনা। সম্পাদক তার কবিতা লেখার তাগিদ সম্পর্কে এভাবে বলেছেন –"শরীর ও অশরীর, কিংবা বিকল্প যার চেতনা ও অবচেতনা; মানে ডাঙ্গার বোধ নিয়ে জলের গঠনের দিকে চলে যাওয়া, আর তারই জন্য শব্দ-চিত্রকল্প-প্রতীকের মূর্ত ও বিমূর্ত মিশ্রণে যতো চেষ্টা ও সংগ্রাম অনুভব করি, তা অন্যের কাছে সঞ্চারিত করে দিতে চাই ব'লেই আজো লিখি। সশব্দে লিখি না, কারণ শব্দের বহুব্যবহৃত অনুষঙ্গ ভেংগে দিতে গিয়ে অন্তর্জীবনে কেবলই নিভৃত রক্তক্ষরণের বেদনা বেড়ে যায়, সে তুলনায় কবি ক্ষমতাকে কখনো মনে হয়নি অলৌকিক। নিঃশ্বাসের ছন্দে লেখা যায় কবিতা – অন্য আর কিছুতেই নয়, তাই সংগোপনে লিখি"।[১]

দেশান্তর মুলত কবিতা পত্রিকা। মৃণাল বসু চৌধুরীর উদ্যোগেই এই পত্রিকার সূত্রপাত। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কবি সৌমেন সেন। অত্যন্ত সুপাঠ্য ও আধুনিক মান সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মাত্র দুটি সংখ্যার পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

দেশান্তর মাত্র একটি সংখ্যাই পাওয়া গেছে। তবে সত্তরের দশকে যে কাব্য-আন্দোলন সারা উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে চলেছিল সেই আন্দোলনে পত্রিকাটি একটি অন্য মাত্রা সংযোজন করেছিল। এই পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রিকার মতো সেই একই কবিগোষ্ঠীকে দেখা যায়। যারা সেই যুগে কবি হিসাবে বেশ নাম করেছিলেনও আজ যারা লব্ধ প্রতিষ্ঠিত। মৃণাল বসু চৌধুরী নিজে কবি ছিলেন। সম্পাদক সৌমেন সেনও তাই। ফলে কবিতা পত্রিকা হিসাবে পত্রিকাটি যে অতি উঁচুমানের ছিল তা বলাই বাহুল্য। আধুনিক কাব্যধারায় অনুপ্রাণিত প্রতিটি কবিতা।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের ‘স্বাধীন দেওয়াল’, উদয়ণ ঘোষের ‘রাজ্যেশ্বরী’, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের ‘তেত্রিশের জন্মদিনে’, সুকুমার বাগচীর ‘শুধু ছায়া’ ইত্যাদি কবিতা আধুনিক কাব্যের জগতে বিশেষ সমাদর লাভের যোগ্য। দুই-একটি গল্প রয়েছে। তবে কাব্যিক ঢঙ্গে লেখা গল্পগুলো রসোতীর্ণ হতে পারেনি। বক্তব্যের স্পষ্টতা সুপ্রমাণিত হয়নি। তবে বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি আধুনিক কবিতা পাঠককে সঠিক পথ প্রদর্শনে যথেষ্ঠ সহায়ক হয়েছে বলে মনে হয়।

কবিতা:

স্বাধীন দেওয়াল– বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

বাগানে অলসভাবে তুলে নেওয়া, তুলে
উৎসর্গবিহীন
শব্দে – শব্দান্তরে থাকে যে রকম
কপর্দক শূণ্য বান্ধব
হয়ত তাদের হাতে কবিতার নেই সে সময়;
কিংবা সে চাবির গুচ্ছ কবিতারই শত্রুকে এখন
তুলে দিতে চায় তার বুককেস
জানিনা আমূল বিদ্ধ ক্ষত থেকে
আছে কি সুদূর কোনো ক্ষতস্থান;
যেখানে কাঁচের টুকরো বিঁধে আছে কবিতার কাঁচের শরীরে,
যেখানে শত্রুরই হাতে কবিতার শব্দকে এখন
ভেঙ্গে যেতে হবে”।[২]

রাজেশ্বরী– উদয়ন ঘোষ।

‘যখন হাউই পোড়ে, গ্রেনেড ও মর্টারে গর্জে প্রতিরোধ

দেশজোড়া বুভুক্ষার

রণক্ষেত্রে চামড়া পোড়ে, পুড়ে যায় শত শত নবীন সৈনিক

দিন পোড়ে, মাস পোড়ে, যৌবনের পেট্রোল পুড়িয়ে

বার্ধক্যের রণাঙ্গনে ছুটে যাই

অলক্ষ্যে তখনও খেল বীজ বপনের খেলা

সংগ্রামে ধুন্ধুমারে বেড়ে ওঠা দাড়ি চুল

সমস্ত শরীরে জমা ধূলো

মেঘ গর্জনের মতো গুরু গুরু রাইফেলের শব্দ, হুহুংকার৷

আমার বুংকার, গুলি, শিরস্ত্রাণ

গোপন পল্লবে

দক্ষিণের বারান্দার কাছে মেলে প্রতিশ্রুতি

মেলে ফুলদল

রাজেশ্বরী তোমার জন্যই”।[৩]

কবিতা ছাড়াও পত্রিকাটিতে রয়েছে দু-একটি গল্প৷ মৃণাল বসু চৌধুরীর ‘হাওয়ার নিঃশ্বাসে আমি’, সৌমেন সেনের ‘লালবল’ ইত্যাদি৷

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

কেউ কেউ কবিতার পাঠক – বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য।

আজকালকার কবিতা দুর্বোধ্য – এই মতবাদ প্রায় সকলেরই। প্রাবন্ধিক এখানে বোঝাতে চাইছেন গদ্য ও পদ্যের শব্দ এক হলেও অনির্বচনীয় অনুভব এক নয়। কবিতা পাঠের মানসিকতা থাকতে হবে। ..... "আমি সমগ্র একাগ্রতা নিয়ে চেষ্টা করি শব্দ খুঁজে নিয়ে তাদের তেমন ভাবে সাজাতে যাতে শব্দের বিকিরণের শক্তি বেড়ে যায় - পরিচিত অর্থের বেড়া পেরিয়ে শব্দ হবে শব্দভেদী। আসলে শব্দ শৃঙ্খলার নতুনত্বে জন্ম নেয় উপযুক্ত কবিতার ভাষা। যে সব শব্দে পত্রিকায় সংবাদ লেখা হয়, সে সব শব্দেই কবিতাও লেখা হয়, তবু দুটো ভাষা আলাদা, শব্দের কোন স্থির এক অর্থ হয় না – পাশাপাশি শব্দের উপর প্রতিটি শব্দের অর্থ নির্ভরশীল। কথাটা মনে রাখলেই কবিতার ভাষা কেন আলাদা হয় (কেনই বা কবিতাকে কঠিন মনে হয়) আশাকরি বুঝতে অসুবিধে হবে না। তাই দৈনিক পত্রিকা পাঠের অধিকার জন্মালে, কিংবা দু চারটা পাশ দিলেই কবিতা পাঠের অধিকার জন্মায় না, তারও জন্য অধ্যবসায় চাই, শিক্ষিত মানসিকতা চাই"।[৪]

উদাসীন

সত্তরের দশকে কবি অরুণ চন্দ সম্পাদিত এই কবিতা পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। তবে প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে পত্রিকাটি সম্পর্কে বিশদ ভাবে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।

পার্বতী (কার্ত্তিক ১৩৭৭, অক্টোবর ১৯৭১)

সম্পাদকীয়তে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলা হয়েছে - "দেশ আমাদের সকলের – সকলেরই দায়িত্ব আছে কল্যাণের পথে দেশকে এগিয়ে নিয় চলার। সে দায়িত্ব মেয়েরাও সুযোগ, সাধ্য অনুযায়ী মাথায় তুলে নিয়েছে। ঘরে ঘরে নতুনভাবে

দেশপ্রেমের মন্ত্র দিয়ে মেয়েরাও করতে পারবে দেশকে সবল - স্বাধীনতা রক্ষার সহায়ক হবে সবাই, এ চেতনা জাগুক সবার মনে, এই কামনা।[৫]

লাইতুমখ্রা মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদিকা ছিলেন অরুন্ধতী দাশগুপ্ত ও সহ সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী সুনন্দা চট্টপাধ্যায়। পত্রিকাটি কতদিন চলেছিল বা ক'টা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। শ্রীমতী সুনন্দা চট্টপাধ্যায়ও জরাগ্রস্থ ও স্মৃতিবিভ্রমে আক্রান্তা। ফলে সঠিক খবর লাভ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

'পার্বতী' পত্রিকাটিকে এক কথায় নারীশক্তির ধ্বজা বাহক পত্রিকা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে বলে পত্রিকাটির সমস্ত রচয়িতাই মহিলা। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঁদী' –(যা পার্লবাকের গল্পের অনুবাদ) অদ্বিতীয় হয়েছে। এও সাবলীল অনুবাদ বোধকরি বহু প্রতিষ্ঠিত লেখকের পক্ষেও সম্ভব নয়। ইন্দ্রাণী গুহের অ্যালেন র‍্যান্‌কিনের 'ভিক্টরী ফর ভ্যালেরী' অবলম্বনে রচিত অসাধ্য সাধন ও আরও একটি অপূর্ব অনুবাদ। এছাড়া গল্পের ক্ষেত্রে 'পরগাছা ' একটি অসামান্য গল্প। ৭০-এর দশকে অনুন্নত বাঙালি সমাজে বিধবা নারীরা দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য যে ধরনের জীবন ব্যায়িত করতেন -- এই গল্পে অপূর্ব ব্যঞ্জনার সঙ্গে তা পরিবেশিত হয়েছে। ৭০-এর দশকে মহিলারা যে একটি পত্রিকা বের করবার সাহস করেছিলেন সেই জন্যই তারা প্রশংসার্হ। আর এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তাদের এই প্রচেষ্টা ও উদ্যম যথার্থই সফল হয়েছিল।

পত্রিকাটি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই তেমন জানা যায় না। তবে মহিলা পত্রিকা হিসাবে 'পার্বতী'র মান আমার যথেষ্ট উঁচু বলেই আমার মনে হয়েছে। পত্রিকাটি দ্বিভাষিক ছিল। অসমিয়া ও বাংলা দুই ভাষার লেখাই দেখতে পাওয়া যায়।

এটাই প্রথম মহিলা পত্রিকা যেখানে দেশের দুর্দশা সম্পর্কে স্বল্প হলেও ভাবের স্রোত দেখা যায়। সত্তরের দশকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তু দলের কথা সম্পাদকীয়তে ঠাই করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভঙ্গুর সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য সচেতন করতে রবীন্দ্রনাথের 'সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের ভয়াল রূপ অমলা মৈত্রের 'নাদির শাহের পুনরার্বতন' প্রবন্ধটিতে ফুটে উঠেছে। পত্রিকাটিতে রয়েছে অসমিয়া নাটিকা শতাব্দীর অভিশাপ। এছাড়াও রান্না বান্না ঘরোয়া টুকিটাকি নামে কিছু বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়।

কবিতা

মাঝখানে- নীলিমা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

আনন্দের পৃথিবী ছাড়িয়ে এলাম
কখনও ছুটে, কখনও থেমে থেমে
পৌঁছে গেলাম মাঝ বয়সের দরজায়।
মন বললে হায় রে, শুধুই কষ্ট
আমি বললাম না দেখেছি স্পষ্ট
ভারী মজা কানামাছি খেলায়।[৬]

গল্পঃ

পরগাছা - মায়া বসু (কলকাতা) - দুই প্রায় অনাত্মীয়া সহায় সম্বলহীনা নিরাশ্রয় বিধবা বৃদ্ধা পরগাছা হয়ে পড়ে থাকেন সম্পন্ন দূর আত্মীয় দত্ত বাড়িতে। তাদের কাজ মাত্র একে অপরের সংগে নিজের অশ্রয়দাতার পক্ষ অবলম্বন করে ঝগড়া করা। যার জিভ যতখানি বিষ ঢালতে পারবে, তার আদর সে পক্ষে ততখানিই বেশি। কিন্তু যখন দত্তরা বাড়ি বিক্রি করে ফ্ল্যাটে গিয়ে

উঠলেন তখন এই দুই বৃদ্ধার আর প্রয়োজন রইল না। ফলে তাদের স্থান হল কাশীর বৃদ্ধাশ্রমে। ৭০-এর দশকের করুন অথচ সত্যনির্ভর কাহিনি।[৭]

বাদী - পার্লবাক, অনুবাদ সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়।[৮]

ছন্দরাজ - শ্রীমতী শঙ্করী সেনগুপ্ত।[৯]

অসাধ্য সাধন - ইন্দ্রানী গুহ।[১০] ----মানসিক ও শারীরীক ভাবে পঙ্গু মেয়ে ভ্যালেরীর জীবনযুদ্ধে জয়লাভের গল্প।

<u>প্রবন্ধঃ</u>

নাদির শাহের পুনরাবর্তন – অমলা মৈত্র

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল, সেই প্রসংগে এই প্রবন্ধের অবতারণা। নাদির শাহ যেভাবে ভারতকে তছনছ করেছিলেন, আজ বিংশ শতাব্দীতে তারই পুনরাবর্তন দেখা যাচ্ছে শস্য-শ্যামলা বঙ্গ মায়ের বুকে৷ ৭০-এর সেই সময় বাংলাদেশের ভয়াবহতা কী চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছেছিল তা কথা এখানে রয়েছে। -"বাংলার গৌরব বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহ স্থিত গৃহ ও সেখানে রক্ষিত তাঁর ব্যবহৃত আসবাব, প্রিয় কলম এবং পাল্কি যা তাঁর ভক্তরা অতি সযত্নে রক্ষা করে রেখেছিল সেই সব অতি বর্বরতার সংগে নষ্টকরে দস্যুরা তাদের অসভ্যতার ও পশু প্রবৃত্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছে। .....দুর্বৃত্তদের হাতে দেবস্থান উপাসনাগৃহ কিছুই রেহাই পায়নি। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা নির্বিচারে ধ্বংস হয়েছে৷ .....নির্মম দস্যুরা চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করে অসুস্থদের শয্যা থেকে তুলে হত্যা করেছে। সেবিকাদের ধর্ষণ ও হত্যা করেছে"।[১১]

আকস্মিক (১৯৭২-১৯৭৭)

সাহিত্য প্রেমী শ্রী বিমল সেনগুপ্তের আরও একটি সৃষ্টি এই আকস্মিক পত্রিকাটি। পত্রিকাটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি ধূমকেতু এ ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। রাজনৈতিক বিষয়ীভূত লেখা পত্রিকাটির মুখ্য বিষয় ছিল, বোধকরি তাই এই নামের প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল।

পত্রিকাটি মোট ৫ বৎসর চলেছিল। নির্ভুল প্রামাণিক সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও যে ক'টি সংখ্যা পাওয়া গেছে এবং আলাপচারীতার মাধ্যমেযে তথ্য উদ্ভাসিত হয়েছে তা থেকে মনে হয় পত্রিকাটি মোট ৫-৬ বছরে বড় জোর ১০-১২ সংখ্যাই প্রকশিত হয়েছিল। পত্রিকাটিতে বাংলা তথা ইংরাজি দুই ভাষার রচনাই রয়েছে।

মুলত রাজনৈতিক প্রবন্ধে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে শৈলেন গুহ নিয়োগীর "খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়ের রাজনৈতিক ইতিহাস" নামক বিশাল প্রবন্ধ যা খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল – এক অভূতপূর্ব প্রবন্ধ। যদিও কংগ্রেস সংগঠনের ইতিহাসই এই প্রবন্ধের বক্তব্য তবুও এ এক আকর প্রবন্ধ। এতদ্ ভিন্ন বিমল সেনগুপ্তের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, পি সি বিশ্বাসের 'Politics of Meghalaya: Background and Perspectives' প্রবন্ধগুলি রয়েছে। যা কিছু কবিতা ও দু একটি গল্প ও আকস্মিকে দেখতে পাওয়া যায় তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

আকস্মিককে যথার্থ অর্থে সাময়িক পত্রিকা বলা যায় কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পত্রিকাটিতে রাজনৈতিক মতবাদ সমৃদ্ধ রচনা দেখা যায়। তাও আবার একই লেখকের রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রতি সংখ্যায় রয়েছে। লোককথা, জনজাতির সম্পর্কিত প্রবন্ধরচনা কিছুই কোন সংখ্যায় দেখা যায় না। আপাত দৃষ্টিতে পত্রিকাটি সম্পাদকের বক্তব্যের বাহন হয়েই থেকে গেছে।

শতাব্দী (অক্টোবর ১৯৭২ – ১৯৮৩)

১৯৭২-এর শেষ পাদে আরও একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। পত্রিকাটির নাম ছিল শতাব্দী ও সম্পাদক ছিলেন শংকর চক্রবর্তী। প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন কবি মৃণাল বসুচৌধুরী। পত্রিকাটির মোট ২০-২২টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। তার মধ্যে গোটা ৬টি সংখ্যা পাওয়া গেছে।

যদিও সম্পাদক পত্রিকাটিকে এক পূর্ণাঙ্গ সাময়িক পত্রিকা বলতেই বেশি আগ্রহী কিন্তু পত্রিকাটিতে কবিতার বাহুল্য দেখে তাকে 'কবিতা পত্রিকা' বলাই বোধকরি সংগত। দু-একটি গল্প-প্রবন্ধ রয়েছে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তবে কবিতার অনুপাতে কিছুই নয়।

প্রাপ্ত সংখ্যার আধারে বিচার করলে প্রথমেই বলতে হয় পত্রিকাটির প্রচ্ছদের কথা। সেই সময়ে প্রচ্ছদের ছবির ব্লক তৈরি করতে গৌহাটী পাঠাতে হত বলে বেশির ভাগ সম্পাদকই প্রচ্ছদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। সেক্ষেত্রে 'শতাব্দী' প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের আঁকা ছবিকে প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করেছে দেখা যায়। আর 'শতাব্দী'র অক্ষর বিন্যাস করেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। অর্থাৎ 'কভার যে লিটল ম্যাগাজিনের ললাট' সে কথা 'শতাব্দী'র সম্পাদক অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

কবিতার সম্ভার পত্রিকাটিতে রয়েছে। সমস্ত কবিতাই আধুনিক, সমকালীন, চিত্রকল্পের চাদরে মোড়া। কবি মৃণাল বসুচৌধুরীর তত্ত্বাবধানে থাকা পত্রিকায় কবিতার বাহুল্য অতি স্বাভাবিক। আধুনিক মানের কবিতাবলি হওয়ার দরুন সমস্ত কবিতাই উৎকৃষ্ট, এ কথা হয়ত অতিরঞ্জন হবে। তবে বেশ ভাল কবিতার সংগ্রহ পত্রিকায় দেখা যায়। যদিও বীরেন রক্ষিত, কমল সাহা, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, সৌমেন সেন, মৃণাল বসুচৌধুরী – সেই একই কবিগোষ্ঠীর কবিতার বিস্তার রয়েছে তবেকিছু নবীন কবিদের কবিতাও 'শতাব্দীতে' স্থান করে নিয়েছিল।

যেমন – অমৃত কচলে বিষ[১২], সাক্ষর ইত্যাদি। কলকাতার বিখ্যাত কবি যেমন – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রীদের অনেক কবিতা রয়েছে এখানে।

কবিতা ও গল্পের ক্ষেত্রে অনুবাদ কাজও চোখে পড়ে।

প্রবন্ধ মাত্র দুএকটি রয়েছে। তার মধ্যে বীরেন রক্ষিতের 'কবিতার উদ্দেশ্যে[১৩]', সৌমেন সেনের 'ছিন্ন অস্তিত্ব মফস্বলি মধ্যবিত্ত'[১৪] বেশ ভাল। এ ছাড়াও কিছু রচনা রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এ রচনাগুলোকে গদ্য মনে হলেও সমস্তই কবিতার আঙ্গিকে রচিত। কোনো প্রথাগত গদ্যের আমেজ এই সমস্ত রচনায় নেই।

<u>পাহাড়ীয়া (৯ই আশ্বিন ১৩৮০, অক্টোবর ১৯৭৩)</u>

শিলং এর কবিতা পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক পীযূষ্ কান্তি ধর প্রায় বছর চারেক পর নিজস্ব পত্রিকা পাহাড়ীয়া শুরু করেন। এটিও বস্তুত কবিতা পত্রিকাই ছিল। এতাবৎ পত্রিকাটির প্রায় ৯৯টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে (সম্পাদকের মতে)। ২০০৬ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশ হয়েছে এমন প্রমাণ রয়েছে। গত ক'বছর ধরে পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হচ্ছে না। যদিও পীযূষ ধরের ইচ্ছা ও উৎসাহ সম্পূর্ণই রয়েছে পত্রিকাটির পুন প্রকাশের জন্য। প্রাথমিক স্তরে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ছিল প্রায় বছর পাঁচেক। পরবর্তীতে তা বৎসরে দুই বা কমে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

'পাহাড়িয়ার' প্রথম সংখ্যাটি 'ট্যাবলয়েড'–এ বেরিয়েছিল। মাত্র দু পাতার পত্রিকা ছিল। কোন সম্পাদকীয় দেখা যায় না। ১৯৭৫ –এ তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করা পত্রিকাটি সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্যে কোথাও যেন সামান্য হলেও আত্মশ্লাঘার সুর বেজে উঠেছে। ---"এক বোতল রক্ত ঢেলে তৃতীয় বছরে পা রাখলো। আরও বোতল বোতল রক্ত তার হেফাজতে জমা আছে। সে তার কবজীর জোরেই সাহিত্য আসরে জায়গা করে নেবে। কারো ভ্রুকুটিকে সে

পরোয়া করে না। পাহাড়িয়ার প্রশস্ত বুকে কোন নীচতা নেই। যারা নিজেদের মস্ত বড় কিছু মনে করেন সবিনয়ে তারা দূরে থাকুন"।[১৫] কথাগুলি প্রচ্ছদপটে রয়েছে।

'পাহাড়ীয়া' পাহাড়ীয়া ঝর্ণার মতই কেমন যেন বাঁধনহারা পত্রিকা। নিয়মনীতির বশ্যতা স্বীকার এই পত্রিকার লক্ষ্য কোন কালেই ছিল না। সাময়িক পত্রিকার নিয়মাধীন কিছু বিষয় যেমন – সম্পাদকীয়, পৃষ্ঠা সংখ্যা, কবিতা-গল্প-নাটকের পারম্পর্য ইত্যাদি কোন কিছুই এই পত্রিকার সব সংখ্যায় নেই। কোন সংখ্যায় কোন একটি নিয়ম রক্ষিত হয়েছে তো কোন সংখ্যায় অপরটি আবার কোন সংখ্যায় কোন রীতিরই অস্তিত্ব দেখা যায় না। পত্রিকাটিকে সাময়িক পত্রিকা বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ঠ সন্দেহ থাকলেও আক্ষরিক অর্থে এ এক কবিতা পত্র। আত্মভোলা সুকবি পীযূষ ধরের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব করেছে এই পত্রিকাটি। আধুনিক কবিতার ধ্বজাবাহী এই পত্রিকার সমস্ত কবিতাই আধুনিক। চিত্রকল্প, ইংগিত-ব্যাঞ্জনা, বাক্যবিন্যাসে নতুনত্ব, অভিব্যক্তিবাদ, হিন্দি-ইংরাজি বাক্যে শব্দভান্ডারের বিস্তৃতি, অব্যক্ত ভাবের ছন্নছাড়া বিহার, সমসাময়িক পরিস্থিতি ও রচনারীতি এই পত্রিকার সমস্ত কবিতার ছত্রে ছত্রে রয়েছে। কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পাদক সর্বদা সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেননি। ভাল কবিতার পাশাপাশি বেশ কিছু অবোধ্য কবিতাও এই পত্রিকার সঙ্গীভুত হয়েছে। এই পত্রিকায় ও মূলত তদানীন্তন শিলং তথা কাছাড় আসামের সেই একই কবিগোষ্ঠীর প্রাধান্য চোখে পড়ে। প্রথম দিকের পাহাড়িয়াতে দু-একটি গল্প দেখতে পাওয়া যায়। তবে ১৯৮৬-৮৭ এর পর থেকে আর গল্প দেখা যায় না। সম্পূর্ণই কবিতা পত্রিকা হয়ে উঠেছে। তবে যা কিছু গল্প রয়েছে তাও কাব্যিক ছাঁচে ঢালা। গল্পগুলোর এক নিজস্ব আয়াম রয়েছে।

প্রথমদিকে নবপ্রজন্মের অনেক কবিদের কবিতা এই পত্রিকায় দেখা যায়। প্রবীণ নবীনের এই মিলনই বোধকরি পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু হবার মূল কারণ। দু-একটি অনুবাদ রয়েছে তবে তাও সংখ্যায় অতি নগণ্য। নিম্নে একে একে কবিতা গল্প প্রবন্ধের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে।

<u>কবিতা</u>

নিঃস্ব সূর্য চাঁদ - রমানাথ ভট্টাচার্য

বালক বয়স থেকে

এক চোখে সূর্য জ্বলে আর চোখে চাঁদ

তবু তুমি চির-অন্ধ, দিব্যদৃষ্টি হলোনা তোমার।

তোমাকে সোনালি দিতে কপিলাবস্তুর রাজা হলো যাযাবর

অস্ত্রহীন দেবদূত সম্রাট অশোক

তবু তুমি অন্ধকার, তোমাকে আলোক দিতে নিঃশ্ব সূর্য চাঁদ।[১৬]

মায়ামৃগ - জহরলাল বেরা

"নীরব সন্ধ্যা আকাশে উড়ে যায় চিল

প্রদীপ জ্বালার সব পান্ডুলিপি করে অয়োজন

"সাতটি তারার তিমিরে" অই সুরঞ্জনা করে ঝিলমিল

মেটে ছিল কি তাঁহার সকল প্রয়োজন

হায় জীবনানন্দ! ফুরায় নিতো আজও জীবনের সব লেনদেন

অইতো বিরাজিছে কাব্য ধারায়, সেই নাটোরের ----

বনলতা সেন"।[১৭]

ভ্রূণের প্রার্থণা– বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়

আমাকে তুমি নষ্ট কর'না মাগো

এসোনা ফেলে নর্দমা বা গুহায় ফুটপাতে

দুহাতে তোমার গলা জড়াবো মাগো

মনে মনে বলব মা আমার শতরূপা

মাগো কী দোষ আমার বল তুমি ওগো মা

এ আকাশ রোদ স্বর্ণময়ূর আঁকা

আমায় তুমি বাঁচতে দিয়ে দু'চোখ ভরাও মাগো

ও বাতাস বড় মধুর পাখীর কলতানে মুখরিত

ও ঘাস বড় কোমল সবুজ ঘন মায়ার

তোমার দু হাতে মাগো জোৎস্নার মত নেচে উঠে আমি

হামাগুরি দেবো আঙ্গিনায়

ওগো আমার মা, তুমি আমায় হেলায় ফেলায় নষ্ট কর'না। [১৮]

চেরাপুঞ্জীর প্রাচীন পাহাড় - কিনকাম সিং নংকিনিরী, অনুবাদ তাপস রায়

এই ভূমি প্রাচীন, খুবই প্রাচীন

আর সহজ জীবনের জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত

দারিদ্র এই পাহাড়ের ভেতর তক খেয়ে ফেলে

পাহাড়ের প্রাণ নিংড়ে নেয় আর প্রতিটি বাজার দিন

পান করে শহরের বাইরে দাঁড়ানো

ট্রাক্টরগুলি।

মানুষ ও গাছ নিজেদের সঁপে দিয়েছে

এক কর্কশ নিচুমানের তুলির কাছে

কিন্তু ঋষির মত দেখতে ওই ঘন ধূসর পাহাড়

দেখলেই আমার বাড়ির কথা মনে হয়।[১৯]

সাঁতার – ১ -ফাল্গুনী চক্রবর্তী

নিশ্বাসের হাপুস হুপুস

মার্কোপলো শার্টের বোতাম ছুঁয়ে

আরও উত্তপ্ত। ঝা ঝা দুপুর

লজিকের কনজাংসন ফরমূলা

ট্রু + ট্রু = ট্রু লাল লিকার

বোতলের ছিপি খোলা হয় না ।

চোখের সান্ধ্য তান ছেড়ে

কেরামের সরতাজ গুটি বদলায়।

বাদামী লাল গোলাপী

প্রথম বন্ধনী থেকে তৃতীয়

উফ প্রপাতিয়া

আর এক উহ্য দুপুর।[২০]

বেশ কিছু উন্নতমানের কবিতা যেমন - বিপরীত কথোপকথন, কিছু বেশি কিছু তার কম (বীরেন রক্ষিত),শব্দের উদ্দেশ্যে, কোথায় দাঁড়াবে শব্দ (বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য), সূর্যোদয় হয় (রণবীর চক্রবর্তী), কবিতাওয়ালা (জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়), দিনিলিপি (স্বর্ণালী বিশ্বাস রায়) ইত্যাদি।

গল্প

কবর খুঁড়ে প্রাসাদ - করুণা কান্তি দাস।[২১]

এক রুগ্ন ক্যান্সার রোগীর জীবন সায়াহ্নের কথা। কীভাবে নিজের হাতে বানানো সুখনীড় ধীরে ধীরে যায় ধ্বসে। স্ত্রী, পুত্র কন্যা এক ঘরে থেকেও হয়ে যায় পর। শুধু রোগীর শেষ প্রশ্ন থেকে যায়, যে লাল দাগ কপালে বয়ে স্ত্রী আজ তাকে ঘৃণা করে সেটাই সুখী সংসার সন্তানের সাথে তারই তো দান।

নীল ছোবল – দীপ্তি ।[২২]--------ঠিক হয়ত একটা গল্প একে বলা যায় না। একটা চিন্তা অথবা স্বপ্নের বুনন।

একটি গোলাপের চারা - সুভাষ দে।[২৩]---চিঠির বয়ানে লিখিত এক ছোট অণুগল্প। নায়িকার হাতে পুঁতে যাওয়া চারা আজ নায়কের বাৎসল্য রসে নিয়মিত জলসিঞ্চনে কুসুমপ্রসবিনী হয়ে উঠবার গল্প। স্মৃতির দোলায় এই গোলাপের চারা করেছে প্রাণসঞ্চার।

ছেলের অসুখ - মিহিরকান্তি রায়[২৪]- বরেনের বিয়ে করবার কোনই ইচ্ছে নেই।বাড়ির সবার বন্ধু বান্ধবের কথা কিছুই তার কানে ঢোকে না। এই দুর্মূল্যের বাজারে বিয়ে করে সংসার চালানো প্রায় দুরূহ। বন্ধু মনীশকে দেখে সে সেটা বুঝেছে। কিন্তু তবুও কোথাও বুকের তলায় এক কোমল স্পর্শের আশা তার থেকেই যায়।

এছাড়াও রয়েছে - ঘুম থেকে জেগে উঠে (মিথিলেশ ভট্টাচার্য)[২৫], সেই জিনিসের জন্য (শংকর চক্রবর্তী)[২৬] ইত্যাদি।

প্রবন্ধ

পাহাড়ীয়াতে বিশেষ প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যায় না। মূলত কবিতাপত্র হওয়ার দরুন এতে প্রবন্ধ আশা করাও বাতুলতা মাত্র। তবুও কিছু কিছু সংখ্যায় দু একটি প্রবন্ধ দেখা যায়।

ঋতুরঙ্গ (১৯৭৩)

শিলঙের কবিতার অপর এক সম্পাদক শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্যের নিজস্ব পত্রিকা ছিল এটি। মোট ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সহ সম্পাদক ছিলেন নিতাই পদ ভৌমিক। এটিও সম্পূর্ণ একটি কাব্য পত্রিকা। শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, জিতেন নাগ প্রভৃতি কবিদের কাব্য এই পত্রিকাটিতে রয়েছে।

সম্পাদক সব পত্র-পত্রিকাকে সাহিত্যের বাহন বলতে নারাজ। কিছু সংখ্যকই সাহিত্য পত্রিকা বাকী সব চালবাজীর ছায়াতলে বেড়ে ওঠা আগাছা মাত্র। ঋতুরঙ্গকে কোন সংখ্যার প্রচ্ছদে "শিলং থেকে প্রকাশিত কবিতাপত্র" এই আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। অনেক আধুনিক মানসম্পন্ন কবিতাগুচ্ছ রয়েছে।

নিজে এক বিশিষ্ট কবি হওয়ার দরুণ সম্পাদকের কবিতার বিচার বিবেচনার প্রশংসা না করে উপায় থাকে না। এই পত্রিকার প্রত্যেকটি কবিতায় সমসাময়িক কালের ছোঁয়া রয়েছে। বিশ্বের বিবিধ কবিতাশৈলীর সাথে পরিচিত এই কবিগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি কবিতাই কাব্যজগতকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশ্বময় যেখানে বাজছে বেদনার বেহাগ সেখানে রোমান্টিক কবিতা বিলাসিতা মাত্র। জীবনময় দত্তের 'সূর্যাকাঙ্খা' কবিতাটি এই ভাবের সফল পুষ্টিকরণে সমর্থ হয়েছে।

সংখ্যায় গরিষ্ঠ না হলেও যে সমস্ত প্রবন্ধ এই পত্রিকায় রয়েছে তার প্রত্যেকটিই গভীর নিষ্ঠা ও মননের ফসল। এককথায় কাব্য-পত্রিকা হিসাবে 'ঋতুরঙ্গের' নাম মেঘালয়ের পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে চিরকাল। 'ঋতুরঙ্গের' কোন কোন সংকলনে সাহিত্যিক বিজ্ঞাপন থাকলেও কোথাও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন দেখা যায় না।

পত্রিকাটির কিছু সংখ্যায় বিশিষ্ট কিছু মানুষের পত্রিকা সম্পর্কিত অনুভবের কথা লেখা রয়েছে। যেমন রামেন্দ্র দেশমুখ্য পত্রিকাটি সম্পর্কে এইভাবে লিখছেন ---"আন্তরিক নিষ্ঠার

মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে 'ঋতুরঙ্গ' ও একটি সুন্দর সাহিত্যপত্র হিসাবে বাংলা সাহিত্যের রাজদরবারে প্রবেশ করেছে বৈ কি ! ২য় বর্ষের প্রথম সংকলনের লেখাগুলি আমার ভাল লেগেছে। জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের উপরে দু'টি প্রবন্ধও সুন্দর"।[২৭]

অশোক বিজয় রাহা ---- "শিলং থেকে প্রকাশিত 'ঋতুরঙ্গ'-এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংকলন পড়ে দেখলাম। অনেকগুলি লেখা ভাল লাগল । মফঃস্বল থেকে এধরনের সংকলন প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়। শিলঙের তরুণ লেখকরা এ-বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন দেখে খুশী হলাম। তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাচ্ছি"।[২৮]

<u>কবিতা</u>

সমুদ্র তো দৃশ্য নয় - যশোধীর চৌধুরী।

* * * *

'সমুদ্র তো দৃশ্য নয়
তবু তার শব্দ শুনি বিডনের বিশপের
জলে
বরফের কুচি গলে গলে শব্দ হয়
প্রার্থনা সংগীতের মতো
অথবা ক্রন্দন
শব্দ হয়
উর্বশীর নাচের মতন"।[২৯]

তোমার প্রতিকৃতি - শক্তিপদ ব্রহ্মচারী।

"কিছুটা ঋণ তোমার কাছে মায়ের রক্তে কিছুটা ঋণ বাকী

মহাজনের খাতায় উঠে নিজের জন্য সামান্য সওদা কী

কেউ রাখে না , গেলাস ভাঙ্গি, ফুলদানি ও

মুঠোর ভিতর তেলচিটে এক স্মৃতি

দেয়াল জুড়ে গেঁথে রাখলাম পুনর্নবা তোমার প্রতিকৃতি"।[৩০]

সূর্যকাঙ্খা - জীবনময় দত্ত।

এই শোষণের শাসনে আবদ্ধ সময়ে রোমান্টিক কবিতা লেখা বিলাসিতা মাত্র। কোথাও সুকান্তের সুর রয়েছে।

কলমে কালি ভরে

শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করে

কবিতা লেখার দিন শেষ।

খাদ্য ক্ষুধা ও শোষণের

সীমাহীন জঙ্গলে

যন্ত্রণাকাতর মানুষ

আজ ফুঁসছে –

সব কটা বুকের মধ্যেই

একএকটা বারুদের স্তুপ"।[৩১]

ভোরের আলো ফুটলেই - শিশির ভট্টাচার্য।

"সময়ের বিক্ষুব্ধ বেলায়

ভারশূণ্য মুহূর্তের অনন্ত দোলকে

উপল সংগ্রহে আমি অবিরত

শ্রান্তিহীন বালকের মতো

সাগ্রহ প্রত্যাশায় ---

যেই; সূর্য গন্ধ আসে

ঘুমে ভেজা প্রান্তরের ঘাসে

ভোরের আলো ফুটলেই .....”[৩২]

অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একগুচ্ছ লোককবিতা এখানে রয়েছে। তথা কথিত ভদ্রলোকদের নিম্নআদিজাতির উপর অকথ্য অত্যাচারের মর্মান্তিক ছবি এক বৃদ্ধ পুত্রের ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকা পিতার কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন

“দন্ডবৎ দেশনেতা বাবু ·····. আমার বেটার খবর

কিছু জানেন আইজ্ঞা। তিনকুড়ি দশ সনের দুপহরে

যখন আঙরার পারা জ্বইলছিল টাঁড়ের জমিন .....

জোড়ের জল শুকাঁই মরা কাড়ার কামের পারা .... তখন

বাবুর জমিনে বেগার খাইটতে খাইটতে

বেটা আমার থ’কে গেল .... বইললেক বেগার খাইটতে লাইরব

রোজের হাজরী মিটাঁই দেন .... ত বাবুর লোক

গাল দিলেক ঘাড় ধইরলেক আমার বেটার .... !

মাঝির বেটার খুনে চিতি সাপের বিষ ঢাইলে দিলেক

ভাতার খাকীর পুতকে ছেঁইচে দিলেক পাথরে ....

পুলিশ সাহেব রসি বাঁইধে চালান করলেক সদরে

উথান থাকইতে জেলে ...। তিনকুড়ি দশ সনের সেই

দুপহরের পর আইজ্ঞা আমার বেটারে আর দেখি নাই ....

বহুত দিন হইল বাবু .... দেখেন কেনে আমার শরীলটো

শুকাঁই যাইছে বুঢ়া মহুল গাছটোর পারা .... মাচানে

কত ঝিঙাফুল ফুইটল কত ঝইরল আইজ্ঞা ....। ত বাবু

শুইললম ইদেসের মন্ত্রী বদলের খবর .... নতুন রাজের খবর ....

ইধার উধার জেলের কপাট খুইলে দিছেক ....। ত রোজই ভাবি

আজ বিহনের রেলগাড়ীটোয় আমার বেটা ফিরবেক ....

ফিরে উয়ার মায়ে বইলবেক না হে সাঁঝের গাড়ীটোয় আসবেক ..।

কবে তক্ক আইসবেক আইজ্ঞা আমার বেটা ....

জেলের কপাটগুলা ছুট বটে না কি ....

ত চারিধারের পাঁচিলটোই ভাইঙে দেন কেনে ....”।[৩৩]

এছাড়াও রয়েছে সময় এক মুহূর্ত (শক্তিপদ ব্রহ্মচারী), ভালোবাসা দর্পণ আত্মার (উর্ধ্বেন্দু দাশ), শুভংকরের রহস্য (তপোধীর ভট্টাচার্য), সুপ্রভাত (দীপঙ্কর নাথ), নীলমণি ফুকনের একগুচ্ছ কবিতা, দেখা (বীরেন্দ্র নাথ রক্ষিত), তার জন্য (পীযূষ রাউত), চিঠি (শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়), জীবন নয়, জাগরণ নয় (অমিতাভ দাস) ইত্যাদি প্রচুর নবীন ও প্রবীণ কবিদের কবিতা।

ঋতুরঙ্গতে কোথাও কোন গল্প বা কাহিনি নেই। পত্রিকাটির প্রচ্ছদেই লেখা রয়েছে ------ “শিলং থেকে প্রকাশিত কবিতা পত্র”। ফলে আখ্যান না থাকাই স্বাভাবিক।

প্রবন্ধ

আধুনিক কাব্যে নতুন দৃষ্টিভংগী - প্রশান্ত জ্যোতি দাস।

আধুনিকতার বিচারে বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাব্যধারায় যে ভোলবদল হয়েছে তারই বিচার বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে রয়েছে। --- "কাব্যিক বিচারে যে সব বিষয় রুচিসম্মত সে সবেরই প্রাধান্য ছিল রোমান্টিক কাব্যে। তাঁর কাব্যের স্বর্গ রচনায় 'রজনীগন্ধার ফুলে' কবি ধরে আনতেন 'বসন্ত বনের গন্ধ'। সৃষ্টি করতেন আপন রুচিমত তাঁর কাব্য জগত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মানসে সে দৃষ্টিভংগীর রূপান্তর ঘটলো। কবি বুঝতে সক্ষম হলেন, মুক্তির সম্ভাবনা নেই 'সাপের একক স্বর্গে'। সত্যের মুখোমুখী দাড়াঁতে হলে মোহমুক্তির একান্ত প্রয়োজন। সত্যকে জানতে হলে তার নগ্ন নিষ্ঠুর রূপটিকেও সাথে সাথে জানতে হবে। বস্তুকে জানতে হবে তার যথার্থ পরিচয়ে। বৈজ্ঞানিক যে দৃষ্টিতে সত্যের রহস্য উন্মোচনে যত্নশীল হন, সে বিমুক্ত দৃষ্টির সাধনাই কাব্যের লক্ষ্য হয়ে উঠলো। ফলে রোমান্টিক মন্ময়ত্বের পরিবর্তে এ কালের কাব্যে প্রাধান্য পেলো 'নৈর্ব্যক্তিক তন্ময়ত্ব''বিষয়ীর আত্মতার' পরিবর্তে 'বিষয়ের আত্মতা'। তদ্‌গত দৃষ্টির সাধনা যে যুগের কাব্যে, সে যুগের কবির পক্ষে কীটস্-এর মতো বলা মুস্কিল হলো যে, 'An artist must serve Mammon; he must have 'Self-concentration' - selfishness, perhaps.' এ যুগের সত্যসন্ধ কবি উপলব্ধি করলেন , "The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality." কবির বিজ্ঞানী মানস সত্যের স্বরূপ খোঁজলো নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে। দৃষ্টি যেখানে সংস্কারাছন্ন, সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সেখানে সম্ভাবনাহীন। ব্যক্তিপুরুষের দৃষ্টিভংগী অতিক্রম না করে আসলে বস্তুর যথার্থসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া স্বাভাবিক। আধুনিক কবি উপলব্ধি করলেন, যতটুকু সফলভাবে তিনি আপনার অহং-কে উত্তীর্ণ হতে পারবেন, সে তুলনায় সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হতে সক্ষম হবেন"।[৩৪]

ধান সিড়ি বেয়ে বেয়ে - রমানাথ ভট্টাচার্য।----জীবনানন্দের কাব্যের পর্যালোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। জীবনানন্দের কবিতা পড়লে মনে হয় যন্ত্র সভ্যতা ক্লিষ্ট, যুদ্ধোত্তর, বিধ্বস্ত পৃথিবীর ছায়া চিত্রই তিনি এঁকেছেন। কিন্তু তা সর্বাংশে সত্য নয়। এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি বিষয়টির স্পষ্টীকরণে সহায়ক হবে।

"জীবনানন্দের কাব্যে বিষাদের ছায়া পড়েছে - করুণ রসের প্লাবন নেমেছে - তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে বেদনার কবিতা তা ঠিক এবং তা হয়েছে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রুগ্ন চেহারার রূপ দিয়ে গিয়ে - কবির বিষাদাছন্ন মানসিকতার প্রকাশ করতে গিয়ে - সর্বোপরি আনন্দের কবি রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের প্রতিকূল পরিমন্ডল রচনা করতে গিয়ে । তাই বলে কবি কোনো প্রত্যয় ভূমিতে এসে পৌঁছতে পারেননি এমনভাবে ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। কারণ তাঁর কাব্যজীবনের শুরু থেকেই জন্মজন্মান্তরের পথ ধরে - মহাকালের পথ ধরে (বিষদ অর্থে মহাপৃথিবীর) শান্ত স্নিগ্ধ দেহের সংগে , তার প্রাণের, তার প্রাণের সংগে (একাত্ম হয়ে যাবার জন্য তাঁর দুর্মর ইচ্ছা ব্যক্ত হয়ে আসছে এবং এই ইচ্ছা পক্ষছায়া বিস্তার করে চলেছে তার সমস্ত কাব্য পরিধির পথে রাজপথে। তাই জীবনানন্দ প্রধানত প্রকৃতির কবি। এমনকি তাঁর শেষের দিকের কবিতা, যেখানে জীবনানন্দ অনেক বেশি বাস্তব-সচেতন সেখানেও প্রকৃতি প্রেম তার অক্ষুন্ন, প্রকৃতির সংগে একাত্ম হয়ে যাবার জন্যে দুর্বার তাঁর ইচ্ছা, অখন্ড তার বাসনা -

..... চোখ ঝলসানো আলো
ভালোবেসে ষোল আনা নাগরিক যদি
না হয়ে বরং হতো ধান সিড়ি নদী"।[৩৫](সে,বেলা-অবেলা-কালবেলা)

আধুনিক বাংলা কবিতার লেখক ও পাঠক - করুণাকান্তি দাস।

অত্যন্ত সুখপাঠ্য। আধুনিক কবিতা চর্চ্চার বিষয়, ভাবনার বিষয়। শুধু কবি হলেই শেষ নয়, পাঠককেও তৈরি হতে হবে।

"কতিপয় মানুষ তাদেরই শিল্পোন্মেষের বিবিক্ত চেতনায় আচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসেন; বলাই বাহুল্য, 'কবিতা' সেই শিল্পচেতনার অস্তিত্বহীন অস্তিত্বের নামান্তর মাত্র ! এবং সেই ভালোবাসার উদাসীন রূপকারই 'কবি'। এ ক্ষেত্রে কবি ও কবিতার সংযোজক রূপালী সাঁকোর নামই যদি 'পাঠক' হয়, তবে এ সম্পর্কে আমার সবিনয় স্বীকারোক্তি ---'কবিতার সত্যিকারের পাঠক সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত এবং কবির সংখ্যা তার চাইতেও কম।' এ ব্যাপারটা ঠিক কার কাছে কতটুকু লজ্জার বা পরিতাপের, এই প্রশ্নের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেননি কোনো লেখক কিংবা পাঠক; এবং ফলে আমাদের পরস্পরকে দোষারোপ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না । আমরা একবারও ভেবে দেখি না, আমাদের নিজস্ব সংকীর্ণবৃত্তের মধ্যে আমরা কত হাস্যকরভাবে বাঁধা পড়ে আছি, যার ছাড়পত্র একমাত্র পারস্পরিক শিল্পচেতনার উদার বিকাশে, পুরনো ধ্যান ধারণাকে আঁকড়ে থাকার অন্ধ বিশ্বাসে নয়"।[৩৬]

এছাড়াও রয়েছে কিছু প্রবন্ধ, যেমন – 'কবিতা সম্পর্কে কিছু ভাবনা' (রমানাথ ভট্টাচার্য) 'অনুভূতির স্বাক্ষর' (প্রশান্ত জ্যোতি দাস)ইত্যাদি। একটা, 'আমার দেখা সূর্যমন্দির' (দিবাকর সেন) নামের ভ্রমণ বৃত্তান্তও দেখা যায়।

<u>রুদ্রবীণা (আশ্বিন ১৩৮২, অক্টোবর ১৯৭৫)</u>

রুদ্রবীণার প্রথম সংকলন পূজোর সময় বেরিয়েছিল । সম্পাদক ছিলেন বেণুমাধব গোস্বামী। অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার মতই এও ছিল স্বল্পায়ু। তবে পত্রিকা হিসাবে রুদ্রবীণা বেশ সমৃদ্ধ যে ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। সম্পাদকের শ্রমিক বা নিম্ন পীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভুতি স্পষ্টতঃ তার সম্পাদকীয়তে ফুটে উঠেছে। শ্রমিক কর্মচারী সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সম্পাদক । ফলে তার পত্রিকাকে তিনি শ্রমিকদের শোক-দুঃখের হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছিলেন । তাঁর নিজের মন্তব্য – "পূর্বাঞ্চলের শ্রমিক কর্মচারী সাধারণমানুষের আশা-

আকাংখা, শোক-দুঃখ এ'তে সূর্য্যের মত প্রকট হবে'। (রুঃপ্রঃবর্ষ, ২য় সংকলণ –আশার কথা) পত্রিকাটিতে দেওয়া বিজ্ঞাপনেই পত্রিকাটির প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হয়েছে। "জীবন সংঘর্ষের মৌলিক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতেই রুদ্রবীণার প্রকাশ। এই সত্য উপলব্ধ লেখাই আশা করি।"[৩৭]

কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয় যেমন ---শ্রমিক সমস্যার বর্ণবোধ, বাংলা সশস্ত্র বিপ্লব ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাজা রামমোহন ও ভারতীয় রেঁণেসাঁস, পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী জনগণ ও নেতাজী সুভাষ, আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ও বর্তমান নারী সমাজ ইত্যাদি পত্রিকাটির চরিত্র নির্ণয়ে সহায়ক হবে। যদিও শ্রমিক সমস্যার কর্ণধার রূপে পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ , তবুও গল্প –কবিতা – ধারাবাহিক উপন্যাস ইত্যাদি মিলিয়ে রুদ্রবীণা এক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকার মর্যাদা লাভ করেছে। বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা ও গল্পের সমন্বয় পত্রিকাটিকে সরস ও সুখপাঠ্য করে তুলেছে।

এছাড়াও রয়েছে দু একটি স্মৃতিচারণ। কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র (হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), সুভাষচন্দ্র (রঞ্জিত নাগ)।

এছাড়াও রয়েছে 'বিবিধ বিভাগ'। ছদ্মবেশি নাট্যগোষ্ঠীর নিবেদন – মহেশ (শরৎচন্দ্র) ও আমিনা – কাহীনি (চিত্তরঞ্জন দাস) মঞ্চাভনয় যা শরৎ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হয়েছিল তার খবর ও এই পত্রিকায় রয়েছে।

এছাড়াও একটি ধারাবাহিক উপন্যাস 'এ গাঙের পার নেই (সত্যেন মজুমদার) রয়েছে। রয়েছে "মে দিবস" সম্পর্কে সম্পাদকের তরফ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উত্তরপূর্বাঞ্চলের সাহিত্য সাধনার খবর পত্রিকাটিতে রয়েছে। দুই একটি বিজ্ঞাপনও রয়েছে। তবে সংখ্যায় খুবই কম।

নিম্নে আলোচ্য পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা গল্প প্রবন্ধের কিয়দংশ তুলে ধরছি।

<u>কবিতা</u>

নতুন পৃথিবী- সাধন বসাক

ধ্বনিত হোক -

রুদ্রবীণার বজ্রকণ্ঠে চিরন্তন শাশ্বত প্রতিবাদ -

সর্বহারা শোষিতের দীর্ঘশ্বাসে

প্রতিটি ছত্র

এক একটি গলিত ইস্পাত।

এ জীবন্ত রক্তাক্ত পান্ডুলিপি

শোষকের নির্মম পরিহাস

শতাব্দীর অলিখিত অত্যাচারের

অশ্রুসজল জীবনালেখ্যের

সকরুণ ইতিহাস।

চারিদিকে উদ্ধত চাবুক

নির্লজ্জ লোভ

বুভুক্ষুর জনতার কণ্ঠে

রক্তঝরা শীর্ণ দেহে দুর্জয় ক্ষোভ

মৃত্যুর পদধ্বনি

পলে পলে শুনি

তবুও হিমালয়ের মতো

অটল বশ্বাসে স্থির

জন্ম দেবই

আরেকটা নতুন পৃথিবীর।[৩৮]

অনুর্দ্ধ বারো বছরের কচিকাঁচাদের নিয়ে নতুন বিভাগ খোলা হয়েছিলো । নাম দিয়েছিলেন 'সবুজের মেলা'।

এই রে ভজা- বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য,বারাণসী,১০বৎসর

এই রে ভজা খাসনে গজা,

খাবি আলুর দম।

ঝাল যাতে হয় বড্ড বেশি

নুন যাতে হয় কম।

বরফ খাবি মন ভুলাবি,

গাইবি মজার গান

গরমা গরম বরফ খেলে

ঠান্ডা হবে প্রাণ।[৩৯]

হাওয়ায় আমার চলাচল - রমানাথ ভট্টাচার্য।

হাওয়ায় আমার চলাচল

প্রেমিক ভ্রমণ করে জন থেকে জনে

প্রবাসী স্বজন বন্ধু

দেশ থেকে দেশে ঘুরে আমার আত্মজ।

আমি রোজ জলবন্দী

ঢেউ এসে ঝাপটা দেয় ধার তলোয়ারে

ওড়ে পাখি ঝরা পাতা

আকাশ আমার ঘর।[৪০]

<u>গল্প</u>

ফাটল - মিহির কান্তি রায়।-----একান্নবর্ত্তী সংসারে শুধু মাইনে কম বলে সপরিবার খেটে যাওয়াই হরগোবিন্দ দেখেছে ও শিখেছে। সেখানে হঠাৎ কুৎসিত অথচ ধনীরদুলালী স্ত্রী পার্বতী এসে চিলের মতো ছোঁ মেরে হরগোবিন্দকে নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। চারশো টাকা বেতনের চাকরী আর পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাটের জীবন যাপনের লোভ অসুস্থ মা, অবিবাহিত বোন ও মুখে রক্ত তুলে রোজগার করা বাবার দুঃখকে ধুলিসাৎ করে দেয়। সম্পদের কাছে মানবিকতা বিক্রি হয়ে যায়। [৪১]

দুসরা বেহুলা - শ্রী মাধব।-----দিনকতকের জন্য বাগানে কাজ করতে আসা শহুরে সুবীরের মন জয় করে এই বনাঞ্চল, এই পাহাড়ী আদিবাসী জীবন। কিন্তু তবুও উন্নতির জন্য সুবীরকে সেই অঞ্চল ছেড়ে যেতে হয়। ছেড়ে যেতে হয় বেহুলাকে। এক আদিবাসী রমণী - যে নিজের অজান্তেই ভালবেসে ফেলে এই 'নতুন বাবুকে'।[৪২]

কোন ধনে হয়ে ধনী - ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য।-----'বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদুর'- একনিষ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে অন্ধ রামদাসের রাধাকৃষ্ণকে নিজের করে পাবার গল্প।[৪৩]

এছাড়াও রয়েছে বিষাদের নদী পেরিয়ে (মিহির কান্তি রায়), এ গাঙের পার নেই (সত্যেন মজুমদার), একটি বিকেল , কয়েক ফোঁটা অশ্রু এবং পারমিতা (করুণাকান্তি দাশ) ইত্যাদি গল্প।

<u>প্রবন্ধ</u>

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু– ব্রহ্মপুত্র।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার ও তৎসঙ্গে তৎকালীন বাংলা দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় নেতাজীর কর্মকান্ডের এক জোরালো বিবরণ এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছে।

"দুর্জয় যৌবনের যিনি মূর্ত্ত প্রতীক, বিপ্লবের বিশুদ্ধ পাবকে যার দেহমন অভিসিঞ্চিত, তার পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবকে সমর্থন করা বা সাহায্য না করে তার সমালোচনা করা কি সম্ভবপর? হয়ত তার এরূপ মনের জন্যি সংঘাত লেগেছিল কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে। কোন আবেদন নিবেদনে নয়, "রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে " - এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তাই দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, "Give me blood, I will give you freedom"। কম্বুকন্ঠে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় আহ্বান তিনিই শুধু জানাতে পারেন যিনি জন্ম বিপ্লবী, মাতৃ-চরণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ মৃত্যু পূজারী বীর। তাইতো বাংলার তথা ভারতের বিপ্লবী তরুণের দল তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল নানাবিধ সাহায্যও সহানুভুতি, পেয়েছিল প্রেরণা। এক স্নিগ্ধঘন মমতা দিয়ে তিনি ঘিরে রেখেছিলেন এইসব মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণের দলকে। সেইজন্যই লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বসুকে বিদেশ প্রেরণ করে তাঁকে দেশোদ্ধারের চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিং এর অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম বীর সৈনিক দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হওয়ায় তিনিও জ্বলে উঠেছিলেন। সেদিন তাঁর দীপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল "এরূপ লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তেই বিরচিত হবে স্বাধীনতার স্বর্ণ সৌধ।" তারপর চট্টগ্রাম ও হিজলীর বন্দী নিবাসে নিরস্ত্র রাজবন্দীদের উপর বর্বরোচিত গুলিচালনার প্রতিবাদে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন সুভাষচন্দ বসু। তাঁরই জন্য ইংরেজ রয়েলিষ্ট দল প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সত্যরঞ্জন বক্সীর বিরুদ্ধে কোনরূপ মারাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস পায় নি"।[৪৪]

রাজা রামমোহন ও ভারতীয় রেণেসাঁস - সৌমেন সেন।

"বস্তুত সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, স্বার্থ যে কোন ব্যাপারেই স্বচ্ছদৃষ্টি ও নির্দ্দিষ্ট পন্থাই রামমোহন। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যেমন, রাজনৈতিক আদর্শে তেমনি, সমাজ সংস্কারের কর্তব্যবোধ ও একই রকম। তাই তাঁর আদর্শ, তাই তাঁর জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিকতাবাদ। এবং রামমোহন ও তার সমকালীন ইতিহাস সমার্থক। বাংলার নবজাগৃতির মূল লক্ষ্মণই তো আত্মআবিষ্কার -জাতীয়তেবোধ ও আন্তর্জাতিক ধ্যাণ ধারণার সম্মিলন"।[৪৫]

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ও বর্ত্তমান নারী সমাজ - ছিন্নমূল (সম্ভবতঃ ছদ্মনাম)

নারী প্রগতির ক্ষেত্রে পুরুষেরা অন্তরায় নয়, বরং সহযোগীর ভূমিকাই পালন করে আসছেন। নারী পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। ফলত নারীর জাগরণে এই বিংশ শতাব্দীতে পুরুষের ভূমিকা কোনমতেই যে ন্যূন নয় সেই প্রসংগে প্রাবন্ধিক বলছেন।

"নারীরা যদি ইচ্ছে করে পিছিয়ে না থাকে কেউ তাদের পিছিয়ে রাখতে পারবে না। বরং পুরুষরা চিরদিনই নারীদের এগিয়ে চলার পথে সাহায্য করেছে, সহানুভুতি দেখিয়েছে। এতে পুরুষরা কখনো নিজেদের ছোট মনে করেনি বা হীনমন্যতায় ভোগেনি। .....এই বিংশ শতাব্দীতে ফিরে আসুন। এ যুগে নারীরা শুধু জেগে উঠেছেন তাই নয়, নারী প্রগতির চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে বলতে হবে।এবং সেই প্রগতির পথে পুরুষ জাতির যথেষ্ঠ অবদান রয়েছে। প্রতিবন্ধক হয়নি উৎসাহ দিয়েছে। অতি সত্য কথা যে পুরুষরা যদি প্রতিবন্ধক হত, বা বাধার সৃষ্টি করত, তা হলে আজ নারী প্রগতির বিজয় রথ সেই অন্ধকার গলিপথেই দুমড়ে পরে থাকত, অথবা শম্বুক গতিতে চলত। নারী পুরুষের সহযোগিতা এবং সহযাত্রা প্রকৃতিরই নির্দেশ। একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। একজনকে অন্ধকারে রেখে আরেকজন আলোয় আসতে পারে না"।[৪৬]

শ্রমিক সমস্যার বর্ণবোধ– নিরুপেক্ষ।

"এখন প্রশ্ন থাকে শ্রমিক শ্রেণী ও দলগত রাজনীতির সম্বন্ধ নির্ণয়। শ্রমিক শ্রেণির মৌলিক পরিচয় নাগরিক হিসাবে । দেশের প্রয়োজনে শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্যবোধ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও শ্রমিক শ্রেণির অবদান কম নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক অন্দোলন যেমন স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ছিল, ঠিক তেমনি শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার যে দাবী করেছিল। এই পটভূমীতে বলা যায় -- দেশের সর্বাঙ্গীন প্রয়োজনে শ্রমিকদের সমাজ সচেতনতা এবং এর প্রয়োগ দেশ এবং জাতির স্বার্থে অপরিহার্য।

অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব বক্তব্য ও আছে। তাদের আরও একটি পরিচয় আছে যা সাধারণ নাগরিক থেকে আলাদা। তারা দেশ গঠনের কাজে সক্রিয়। শ্রমিক কর্মচারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত থেকে দেশের উন্নতি সৃষ্টি করেন । সে কৃষি ক্ষেত্রেই হোক, --- শ্রমিক কর্মচারীরাই দেশের প্রগতির নিয়ামক । ওদেরকে বাদ দিয়ে উন্নতিকামী কোন দেশই এগুতে পারে না । এই বিচারে শ্রমিক কর্মচারীদের কর্তব্য যেমন বেশি ঠিক তেমনি আছে তাদের মৌলিক অধিকার"। [৪৭]

এছাড়াও রয়েছে দু একটি স্মৃতিচারণ । কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র (হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), সুভাষচন্দ্র (রঞ্জিত নাগ)।

এছাড়াও রয়েছে 'বিবিধ বিভাগ' । ছদ্মবেশি নাট্যগোষ্ঠীর নিবেদন – মহেশ(শরৎচন্দ্র) ও আমিনা –কাহিনি (চিত্তরঞ্জন দাস) মঞ্চাভনয় যা শরৎ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হয়েছিল তার খবরও এই পত্রিকায় রয়েছে।

এছাড়াও একটি ধারাবাহিক উপন্যাস 'এ গাঙের পার নেই (সত্যেন মজুমদার) রয়েছে। রয়েছে "মে দিবস" সম্পর্কে সম্পাদকের তরফ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য সাধনার খবর পত্রিকাটিতে রয়েছে। দুই একটি বিজ্ঞাপনও রয়েছে। তবে সংখ্যায় খুবই কম।

সংক্রান্তি (জানুয়ারি ১৯৭৬)

শ্রীমতি মীরা রায়ের সম্পাদনায় এই পত্রিকার উদ্গম হয়েছিল। মাসিক পত্রিকাটির মোট ৬টি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল, দুই বৎসর চলেছিল। সময়ের নিয়ম ধরে পত্রিকাটি কালের অতল গর্ভে তলিয়ে যায়৷ দ্বিভাষিক পত্রিকা, বাংলা ও অসমিয়া দু ভাষার রচনাই এতে স্থান পেয়েছে।

সংক্রান্তিকে হুজুগের পত্রিকা বললে বোধকরি অত্যুক্তি হয় না। বামপন্থী নাট্যসংস্থার উদ্যোগে পত্রিকাটির জন্ম। কলকাতার কম্যুনেলিজমের ধাক্কা মেঘালয়ের রাজধানী শহরকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই নাট্যসংস্থা সর্বপ্রথম শিলঙে পথনাটিকাও করেছিলেন। মঞ্চস্থ করেছিলেন একের পর এক বামপন্থী নাটক৷ এমন অবস্থায় নিজেদের ভাবকে ভাষা দানের প্রয়োজনীয়তা ছিল৷ তারই ফলশ্রুতি 'সংক্রান্তি'৷ আর বিচার করে দেখলে সমস্ত সাময়িক পত্রিকাই তো হুজুগের দান। আর তার পরিণতিও তাই, দু বৎসরে মাত্র ৬টি সংখ্যা প্রকাশের পরই পত্রিকাটি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

পত্রিকাটিতে প্রচুর অনুবাদ কবিতা চোখে পড়ে। তবে স্বতন্ত্র কবিতাও রয়েছে। অবশ্যই বামপন্থী মনোভাবাপন্ন সমস্ত কবিতা। বেশ ভালো কিছু গল্পও রয়েছে। তবে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি প্রশংসার দাবী রাখে। 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ', 'শরৎ সাহিত্যে নারীর মর্যাদা', 'নভেম্বর বিপ্লব' ইত্যাদি তো রয়েছেই উপরন্তু স্বতন্ত্র বিষয়ের প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও সংক্রান্তি সুরুচি ও সুবিবেচনার পরিচয় দেয়। 'সাহিত্যে সমসাময়িক বাস্তবতা', 'সাহিত্যিকের দায়িত্ব', 'সাহিত্য শিল্প ও জনজীবন' ইত্যাদি খুবই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এ ছাড়াও কিছু নাটক পত্রিকাটিতে রয়েছে।

বামপন্থী নাট্যসংস্থার উদ্যোগে পত্রিকাটির জন্ম । সেই হেতু এক বিদ্রোহের সুর সমস্ত পত্রিকাটিকে ঘিরে রয়েছে ।

সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে সংক্রান্তি যদিও বামপন্থী মতাদর্শাবলম্বী পত্রিকা ছিল, তথাপি পত্রিকাটির সাহিত্য গুণ অবশ্যস্বীকার্য। আরও খানিকটা দীর্ঘায়ু হলে বোধকরি পত্রিকাটি সাহিত্য পত্র হিসাবে যথেষ্ঠ সুনাম লাভে সক্ষম হত৷ তবে এ কথা স্বীকার না করে থাকা যায় না যে, পত্রিকাটির কাগজ খুবই নিম্ন মানের ছিল। প্রচ্ছদেও যত্নের কোন ছাপই দেখা যায় না। মুদ্রণ প্রমাদও যথেষ্ঠ রয়েছে। পত্রিকাটিতে বেশ কিছু বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপণ দেখা যায়।

কবিতাঃ

অনেক অনুবাদ কবিতা দেখা যায়। বিশেষতঃ হো চি মিনের কবিতা।বামপন্থী চিন্তাধারায় ইন্ধন যুগিয়েছিল এই বৈপ্লবিক কবিতাগুলি।

এক বন্ধুর কথা ভাবছি - ডঃ হো চি মিন, অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নদীর ধার পর্যন্ত তুমি এগিয়ে
দিতে এসেছিলে
জানতে চেয়েছিলে, কখন ফিরে আসব ;
আমি বলেছিলাম, 'ফসল যখন ফলবে'।
এখন এই ফসল পেকে
গোলা ভরে উঠল,
কিন্তু অদ্ভুত এই বিরূপ দেশ
এখনো আমি জেলের ঘানি টানছি।[৪৮]

ইস্তাহার– মার্টরাড, অনুবাদক চিন্ময় দে

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অগ্নিবর্ষী ভিয়েৎনামে
থ্যাঁৎলানো, বিকৃত এক মুখচ্ছবি
ডাকবেনা আর সাহায্যার্থে।
সে সৈনিক --- নিঃসঙ্গ
অন্ধকার কারাবাসে দিন গুণে
শৃংখলিত অবশ চামড়ায়
কুয়াশাঘন মুক্তির নিশ্বাসে।
*******[৪৯]

নভেম্বর বিপ্লব- অনীতা গূণ।

অবশেষে শীতের নভেম্বরে
'পেত্রোগ্রাদে' সশস্ত্র বিপ্লব
জোৎস্নামাখা কাস্তেটাকে বুকে নিয়ে
সূর্য হয়ে জ্বলে উঠ্‌লো
শ্রমিক কৃষকদের ঘরে ঘরে।
আজও সে জ্বলছে ধ্রুবতারার মত
লালে লাল হয়ে
নভেম্বরের হাওয়ায় হাওয়ায়
তোমার আমার সব ঘরে ঘরে
বেঁচে থাকার উত্তপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে। [৫০]

তোমরা যারা - জয়ন্তী দেব

হাত থেকে কেড়ে নিলে কাস্তে

মন থেকে মুছে দেবে মাটি?

দুবেলা জোটে না দুটো পান্তা

যদিও দিনভর বেগার খাটি।

যাদের জঠরে গেছে আমার গোলার ধান

লোভের অতলে গেছে আমার ধানের মাটি।

ভয় এসে থাক তাদের জন্য।

তৃষ্ণার জল আর ক্ষুধার অন্ন

সব হারায়েছি। তাই হারাবার ভয়

জেনে রাখো আর আমাদের নয়। [৫১]

গল্পঃ

মাণিকের মা - অতশী অধিকারী --- এক ভিখারী মায়ের করুণ কাহিনি।[৫২]

উপকথা - শ্রীমতি লিষ্টিনা লিনরার সৌজন্যে প্রাপ্ত খাসি লোককথা [৫৩] ---- খাসি সমাজ জীবনে 'কোয়াই' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। কী করে এই কোয়াইয়ের জন্ম হল তাই নিয়েই এই লোককথা।

চোখ - অবনী কুমার বর্মণ [৫৪]---------- ভোলা আজ ভোলানাথ বাবু হয়েছে৷ এই উত্থানের পিছনে রয়েছে অনেক রাজনৈতিক দলাদলি, খুন, মারামারি। কিন্তু তাকে এ পথে টেনে আনার পান্ডা অমরদা আজ এক অন্ধ ভিখারীর রূপে তারই দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা অভিলাষী। জীবনের এই রূপ ভোলার জীবনের ভিত্‌কে পর্যন্ত পর্যুদস্ত করে দেয়।

ফুলশয্যার রাত - ভিয়েতনামের গল্প অনুবাদ উমা দাস[৫৫] -------- ভিয়েতনামের বিপ্লবের গল্প। এক লাজারুণ নম্র বধূকে স্বদেশপ্রেম তিন বৎসরের মধ্যে করে তোলে এক পরিণত সৈনিকে।

আর্তনাদ - কুলদা প্রসাদ ভট্টাচার্য [৫৬]---------- এক উচ্চশ্রেণির এক্সিকিউটিভ জীবনের –status নিয়ে বিভ্রান্ত। মনে পড়ে তার ছোটবেলার কথা। সংস্কৃত মাষ্টারের ছালে গীতা উপনিষদ শুনে বড় হওয়া, আজ ভুয়ো status দেখাতে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারের নিঃসীম একাকীত্বে তার বিবেক আর্তনাদ করে উঠে, একটু মানুষ হতে চায় সে। আসাধারণ উপস্থাপনা।

এছাড়াও রয়েছে দয়াময় শইকীয়ার (যুগপট)[৫৭], হিন্দি গল্প কৃষণ চন্দরের (বোবা কাহিনি)[৫৮]ইত্যাদি।

<u>নাটকঃ</u>

এ ছাড়াও এই পত্রিকায় দু একটি নাটিকা দেখতে পাওয়া যায় । শ্রমিক মালিকের চিরায়ত দ্বন্দ্ব নিয়েবামপন্থী মনোভাবাপন্ন নাটক 'দিক'(গৌতম ভট্টাচার্য)[৫৯], সুবেণীর অশ্রু (নীলিমেশ বিশ্বাস)[৬০] নাটকের প্লট গতানুগতিক। চা বাগানের শ্রমিকের উপর মালিকের অত্যাচার। শোষিত শ্রমিক এক সময়ে বদ্রোহ ঘোষনা করে ও নায়িকার মৃত্যুতে নাটকের সমাপ্তি। কাহিনির বুনোট বেশ ভাল।

<u>প্রবন্ধঃ</u>

প্রবন্ধ নিবন্ধের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি বেশ উঁচুমানের পরিচয় দিয়েছে ।

'***আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ও শরৎ সাহিত্যে নারীর মর্যাদা***'- মীরা রায় ---মৌলিক নিবন্ধ। নারীর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্রকেও ছেড়ে কথা বলেননি। "শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারায় বাস্তববাদের পরিচয় যথেষ্ঠই পাওয়া যায়। তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে নারীর সম্মান রক্ষায়

সাহায্য করে এ সত্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন। নিম্নশ্রেণির বিধবাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন তারা "হাট বাজারে যায়, পরিশ্রম করে, ধান ভানে, প্রয়োজন হইলে দাসীবৃত্তি করে। সুতরাং সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা তাহাদের পক্ষে সহজ। তাহারা তাই করে, কুলত্যাগ করিবার আবশ্যক হয় না, করেও না। অথচ তাহাদের পক্ষে সে পথ বন্ধ।" (তাহাদের অর্থাৎ উচ্চশ্রেণির বিধবাদের) কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এই মহৎ উপলব্ধিও তাকে নারীমুক্তির সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেনি। নারী ও পুরুষ যে একই সমাজ ব্যবস্থার শিকার, এ সত্য তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে। শুধু পুরুষকেই তিনি দায়ী করেছেন নারীজাতির শোচনীয় অবস্থার জন্য, পুরুষের কাছেই তিনি আবেদন করেছেন নারীর অধিকার রক্ষার জন্য। তাই সাহিত্যের দরবারে যে সব নরনারীকে তিনি হাজির করেছেন তাদের দিয়ে সমাজের প্রচলিত বহুলালিত ভ্রান্তি তিনি দূর করেছেন, ভূয়া আশাবাদ চূর্ণ করেছেন কিন্তু সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারেননি"।[৬১]

সাহিত্যশিল্প ও জনজীবন - পীযূষ কান্তি চৌধুরী --------- প্রাবন্ধিক শোষণবাদ রাজনীতির বিরুদ্ধে সাহিত্যের সৈনিক রূপ দেখার প্রত্যাশী।" সার্থক অর্থে সাহিত্য ও সাহিত্যনীতি তাই হওয়া উচিত যা মানুষকে জীবনবিমুখ করে না, বরং করে তোলে শোষণবাদমূলক অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্থির অবিচল সৈনিক, যাতে বেঁচে থেকেই মানুষ স্বর্গবাস করে। এই বৈজ্ঞানিক জীবনাদর্শে যারা আস্থাশীল তাঁরা সাহিত্যশিল্পে বাস্তবতার নামে শুধু 'যা আছে' তাকেই প্রতিফলিত করে ক্ষান্ত হন না, 'যা হবে' বা 'যা হওয়া' চাই তারও রসাশ্রিত ঈপ্সিত রূপরেখা স্বপ্নমাধুরীও তুলে ধরেন। বাস্তবের অনুসরণে জীবনধর্মী সাহিত্য ও সাহিত্যশিল্পী জনজীবনকে ভবিষৎ প্রয়াসী করে তার চাওয়া পাওয়ার অমোঘ লক্ষ্যে নিয়ে যায়"।[৬২]

সাহিত্যিকের দায়িত্ব - প্রশান্ত চৌধুরী -------- প্রাবন্ধিকের সংগ্রামী মনোভাবের ছায়াপাত এই প্রবন্ধে রয়েছে। "আমাদের দেশে অনেক সাহিত্যিকের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা থাকা সত্ত্বেও শ্রেণীচেতনা ও গণ সংযোগের অভাববশতঃ প্রকৃত লোকসাহিত্য বহুল পরিমাণে সৃষ্টি হচ্ছে না।

সাহিত্যিকের যদি এই দুটিরই অভাব থাকে তবে সর্বহারা ও বুর্জোয়া এই উভয় শ্রেণীই তাকে নিজ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন এবং অধিকতর শক্তিশালীরাই সহজে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। তাই প্রতিটি সমাজ সচেতন সাহিত্যিককে নিজেদের সৃষ্টিকে করতে হবে বক্তব্যনিষ্ঠ যাতে জনসাধারণ কোন বিভ্রান্তিতে না পড়েন। তাদের মনে রাখতে হবে শিল্প সাহিত্য গণজীবনের অংশ এবং গণসংগ্রামেরও অন্যতম হাতিয়ার"।[৬৩]

নভেম্বর বিপ্লব - নমিতা গুণ -- এই প্রবন্ধটি রুশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক অধিকথন। -- "বুর্জোয়া রাষ্ট্রতন্ত্রকে ধ্বংস করার লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার সংকল্পে অটল থেকে সংগ্রামে এগিয়ে যাবার নির্দেশই লেনিন দিয়েছিলেন বলশেভিক পার্টীর প্রতিটি কর্মীকে, রুশ দেশের প্রতিটি স্বাক্ষর শ্রমিককে, যার সার্থক পরিণতি ১৯১৭-এর নভেম্বর বিপ্লব। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল ----বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে সংস্থাপিত করা নূতন শাসকশ্রেণির কর্তৃত্ব। এই নূতন শাসক শ্রেণীই হল শ্রমিক শ্রেণী, যারা নিজের হাতে তুলে নেবে রাষ্ট্রক্ষমতা। রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী বলতে বোঝাবে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী"।[৬৪]

সাহিত্যে সমসাময়িক বাস্তবতা - রঞ্জিত সেন-- জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ। "নির্ভয়ে এই কথা বলা যায় আধুনিকতাবাদ জীবনবিরতিকে (Negation of life) বাস্তবতার সংগে সমীকরণ করেছে, ক্রিটিক্যাল রিয়ালিষ্ট ও সমাজবাদী বাস্তববাদীরা জীবনবিরতিকে গ্রহণ করেছে বাস্তবতার প্রশ্নে ; কিন্তু ক্রিটিক্যাল রিয়ালিষ্টরা এর দ্বান্দ্রিক ঐতিহাসিক বিকাশের অনিবার্যতা উপলব্ধি করতে পারেনি, সমাজবাদী বাস্তবতা এই অপূর্ণতা উত্তীর্ণ"।[৬৫]

এছাড়াও বেশ কিছু প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে রয়েছে। যেমন – ট্রেড ইউনিয়নত উত্তরপূর্ব অঞ্চলর ভূমিকা (সর্বানন্দ দাস) সাহিত্য ও সমাজ (দেবল ভৌমিক) মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা

(শ্রীমতী শর্মা), জনতার শিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ (শ্রী প্রবীণ দাস) ইত্যাদি। লোকনাট্যের উদ্যোগে মঞ্চায়িত কিছু সফল নাটক যেমন চার্বাক, মে দিবস, বিবর্ত্তণ ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

বিভিন্ন বিশিষ্ট মণীষির উক্তি পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ---- রবীন্দ্রনাথ, লেনিন, ক্যামফোর্ট, বুফোঁ, মাও সে তুঙ ইত্যাদি।

অনির্বান (১৯৮২ থেকে ৯১ পর্যন্ত চলেছিল)

সংঘাতের পরবর্তী যে পত্রিকা এও দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেছিল সেটা হচ্ছে অনির্বাণ। পত্রিকাটি পাঠ করলে তার নবজাত অবস্থা থেকে যৌবনের প্রাণোচ্ছলতার এক ধারাবাহিকতা দেখা যায়। প্রথম পাদে অন্যান্য স্বল্পায়ু পত্রিকার মতো অনির্বাণেও অনেক ত্রুটি দেখা যায়। তবে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় পত্রিকাটি সমস্ত ত্রুটিমুক্ত হয়ে এক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকার যথোচিত মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে । পত্রিকাটির মোট ১১টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সমুদ্র গুপ্ত। শিলং লেখক সংস্থার মুখপত্র, সংস্কৃতি সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল এটি। ১৯৭৯ সালে শিলং এ দাঙ্গার প্রভাবে অস্থির জনজীবনে কিছুটা প্রত্যয় এনে দিয়েছিল এই পত্রিকা।

গল্প-কবিতা–প্রবন্ধের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি উর্বরতার স্বাক্ষর রেখেছে । কিছু অন্যান্য সাময়িকীর ভাল ভাল প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। এত বৎসরের জীবনে প্রচুর গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের সমাহার নিজের মধ্যে ভরে রেখেছে পত্রিকাটি। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনেও যথেষ্ঠ সুবিবেচনার পরিচয় দেখা যায়। শিলং-এর তৎকালীন উন্মত্ত রাজনৈতিক পরিমন্ডলে দাঁড়িয়ে এই পত্রিকাই সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংখ্যা প্রকাশ করে। সাময়িক পত্রিকার বৈশিষ্ট্যকে সম্মান জানিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ছবি পত্রিকাটিতে বার বার প্রদর্শিত হয়েছে। পত্রিকাটিতে জনজীবন ও লোককথার উপর অনেক প্রবন্ধ গল্প রয়েছে ।

সেই সময়ের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের খবরও এই পত্রিকায় রয়েছে । তা পরবর্তী প্রজন্মকে ইতিহাস জানতে সাহায্য করবে ।

সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে -"লিখতে হবে বলেই লিখব এ আমরা চাই নে, যে সাহিত্য জনগণের হিত কামনাই করল না, বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংগে সংগতি স্থাপনে ব্যর্থ হল, তাকে সাহিত্য বলি না"।[৬৬]

গল্প-কবিতার ডালি সাজানোই যে কোন সাময়িক পত্রিকার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয় । পাঠককুল তথা সমাজকে সচকিত করা, তথ্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যার মাধ্যমে জনগণকে জাগরুক করাও সাময়িক পত্রিকার কর্তব্যের অন্তর্গত। আর এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শুধু খবর সরবরাহ করাই নয়, প্রয়োজনে বিষয়নিষ্ঠ ব্যাখ্যাও ---- নাটকে মঞ্চসজ্জা , মদ্যপানের ক্ষতি, মেঘালয়ের স্বাস্থ্য দপ্তরে কেলেংকারি, মেঘালয়ের জমি হস্তান্তর আইন ইত্যাদি বিষয়ের উপর পাঠকের সুবিধার্থে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে এই পত্রিকায়।

কাগজের মান, প্রচ্ছদ ও পত্রিকার অঙ্গসজ্জার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।এককথায় 'অনির্বাণে' এক সুস্থ সুন্দর পূর্ণাঙ্গ সাময়িক পত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই রয়েছে।

বিজ্ঞাপণের বাহুল্য না হলেও বাণিজ্যিক সাহিত্যিক সবরকমের বিজ্ঞাপনই এই পত্রিকায় রয়েছে। রয়েছে পুস্তক প্রকাশের বিজ্ঞাপনও। এছাড়া 'অনির্বাণ' কিনবার আবেদন তো প্রতি সংখ্যায়ই দেখা যায়।

চলচ্চিত্র ভিত্তিক বিভিন্ন ফিচার ধর্মী রচনাও পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যায় দেখা যায় । যেমন -খাসি কাহিনি চিত্র 'মাণিক –রাইথং', তিনটি সমসাময়িক স্ত্রী চরিত্র ইত্যাদি।

রয়েছে কিছু সাক্ষাৎকারও।

পুস্তক আলোচনাও পত্রিকাটির বেশ কিছু সংখ্যায় রয়েছে। যেখানে প্রথিতযশা কবি (প্রমথচৌধুরী, হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সঞ্জীব কুমারদাস) এবং তাদেরও বই যেমন আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তেমনি আবার উত্তর পূর্বাঞ্চলের কবিদের যেমন - শক্তিধর চৌধুরী, মাশুক আহমেদ) বই ও আলোচিত হয়েছে।

শিলং-এর নাট্যচর্চ্চা নিয়েও পত্রিকাটির প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই কিছু না কিছু লেখা রয়েছে। যেমন --- শিলং-এর নাট্যচর্চ্চার সমালোচনা, পিপল্‌স্ আর্ট থিয়েটারের মঞ্চস্থ করা বিভিন্ন নাটক সম্পর্কে বক্তব্য, অভিনীত হওয়া পথনাটক ইত্যাদি।

শিলং-এর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে হেমন্ত সন্ধ্যা উদ্‌যাপন, নেতাজীজয়ন্তীতে প্রভাতফেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব, NEHU-তে গ্রাফিক পেইন্টিংস্ ও ড্রইং-এর প্রদর্শনী সমস্ত খবরই সরবরাহ করা হয়েছে ।

<u>কবিতা</u>

বেপথু- উমা পোদ্দার

একঘেয়ে জীবনের ঘানি টেনে টেনে
আজ সে বিরক্ত ;
জীবনটাকে হিসেব করে চলতে চলতে
আজ সে ক্লান্ত ;
তাই, এখন,
প্রাণ প্রাচুর্য্যে জীবনটাকে
এখানে ওখানে ছড়িয়ে দিতে চায়
দুনিয়াটাকে হাতের মুঠোয় এনে

আজ সে ভোগ করতে চায়।[৬৭]

শান্তির পারাবত কে - মীরা রায়

তুমি মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের পক্ষে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে

শান্তির সপক্ষে।

আমরাও তাই।

আমরাও গান গাই জীবনের গান ছাড়াই

সাগর সংগমে নদীর মোহনায় পর্বত শিখরে আর সবুজ

প্রান্তরে।

**********[৬৮]

এই প্রথম জানলাম - রমানাথ ভট্টাচার্য

এই প্রথম জানলাম তোমারো প্রিয় জন আছে

তোমারও দুঃখ হয় প্রিয় বিরহে

তুমিও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ো

তুমিও কাঁদতে পারো - তোমারো চোখ ভিজে জলে।

**********[৬৯]

ফেরা - বিজয় কুমার ভট্টাচার্য

****

বলে যাচ্ছি, সাম্প্রতিক

ষড়যন্ত্রপ্রিয় মেঘ বাতাসের কানে কানে

দেয়াল ভাঙ্গার যা কিছু বলুক না কেন ;

আমি শুধু চেয়েছি নির্মাণ ----

ভাঙ্গা নয়, রক্তপাত নয়, চেয়েছি শস্য ও ফলের

শীর্ষ জুড়ে খেলা করুক রৌদ্রের গাঢ় প্রসন্নতা

আমি বাড়ি ফিরছি।

**********[৭০]

আমার ভাইয়ের রক্ত - কমলেশ পাল

খুব যে ঘোরাচ্ছ খাঁড়া ধর্ম ধর্ম করে

রঘুপতি, আমার ভাইয়ের রক্ত

এক ফোঁটা তোমাকে দেবো না।

রক্ত এত সস্তা নয় যে ঢেলে দেবো ছুরির ফলায়

যদি লাগে রক্ত দেবো ল্যুকোমিয়ায় ভোগা মেয়েটিকে

আমার ভাইয়ের রক্ত পাবে ওই কারখানার আহত যুবক

আমাদের রক্ত পেয়ে সুস্থ হয়ে হেঁটে যাবে জরিনা অরুণ।

**********[৭১]

এছাড়াও অজস্র কবিতা এই পত্রিকার দীর্ঘপথ চলার সাথী হয়ে প্রতি সংখ্যায় রয়ে গেছে। যেমন - আমার আশায় ভালোবাসায় (মীরা রায়), নীরোর বাজনা (আশীষ শর্মা), উত্তমীয় ক্যাপশন্ (উত্তম মন্ডল), সূর্যউঠলে ভোর হ'ত (ভরত ঘোষ), হৃদয়ের সর্বনাশ (শংকর চক্রবর্তী), হলুদ শীষের মাঠ (কৌশিকরঞ্জন আচার্য), জীবন জ্বলছে (রঞ্জিত সরকার), দেশান্তরী মন্ত্রে (পীযূষ ধর), আমি এক সামান্য কবি (বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য), আমারও একটি মন আছে (ঈপ্সিতা দাশগুপ্তা) ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে প্রচুর অনুবাদ কবিতা। যেমন --- অরাজনৈতিক

বুদ্ধিজীবিদের প্রতি (রেনে কাস্তিয়ে, অনুবাদক অভিজিৎ সেনগুপ্ত), হ্যারমান হেসের কবিতা (অনুবাদক সমর বিজয় চক্রবর্তী), আলেকজান্ডার পুশ্‌কিনের প্রতিধ্বনি (অনুবাদক সুব্রত চৌধুরী) ইত্যাদি।

গল্পঃ

অরুণার হাসি - মিহির কান্তি রায় ------- বয়স্কা মেয়ের বিয়ে দিতে নাজেহাল বাবা মা শেষ পর্যন্ত দোজবরে কিন্তু অঢেল সম্পত্তির অধিকারী প্রায় অর্ধবৃদ্ধপাত্রের হাতে কন্যাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। একজন বাবার কাছে মেয়ের মুখের হাসির চেয়ে পেটভরে খেতে পাওয়াটা আজও অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। [৭২]

স্বপ্ন নয়- দিলীপকুমার বন্দোপাধ্যায় -- সাম্প্রদায়িক বিপন্ন বিধস্ত শিলং-এর পটভূমিকায় রচিত গল্পের নায়ক অমিতেশ কিছুতেই ঘর ছেড়ে যেতে চায় না এ শহর। আশা রাখে ভবিষৎ এর সুদিনের ।[৭৩]

মা - পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য ------ মায়ের মমতা চিরকালীন। যদিও বাড়ির গিন্নী বেড়াল দু চোখে দেখতে পারেন না তথাপি সেই বিড়াল যখন অন্তঃসত্ত্বা হয় সেই গিন্নীই সমব্যাথী হয়ে এগিয়ে আসেন তার পরচর্যায়। ভিন্ন স্বাদের মৌলিক গল্প।[৭৪]

দৃষ্টিপাত - রাখী ভট্টাচার্য ---- মৌলিক গল্প। আজকের যুগে ডাক্তারী সেবা না হয়ে কতকটা মোসায়েবী হয়ে পড়েছে। মন্ত্রীর চোখ দেখা অনেক জরুরী সেই বৃদ্ধের চেয়ে যার দুপায়ের উপর ভর করে দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। কিন্তু তাকে প্রতীক্ষার প্রহর গুণে যেতে হয় দুই চার মায় ছয় ঘন্টা। [৭৫]

মাঝ উঠানে রোদ - মিহির কান্তি রায় ------ বেকার জীবনের দুঃখ কষ্টের কাহিনি। গতানুগতিক প্লট। তবে পরিবেশনার গুণে গল্পটি বেশ আকর্ষক হয়ে উঠেছে। [৭৬]

জীবন নিয়ে খেলা - সনৎ বসু ------ এক সময়ের 'সাচ্চা' অ্যাথলিট বদ্রী মল্লিক এখন রাস্তায় জ্যান্ত ব্যাং মাছ গিলে এবং তা উগরে দিয় খেলা দেখায়। পাড়ায় মাস্তানদের খপ্পরে পড়ে তার একমাত্র ছেলে পিন্টু আজ দৃষ্টিহীন। আজ সন্তানকে দৃষ্টিদানের জন্য পিতার এই নিত্য জীবনকে পণ করে খেলা। অপূর্ব ও মৌলিক গল্প।[৭৭]

আলতা - পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য ----- দেশবিভাগে ছিটকে যদিও মানুষ চলে এসেছিল তবুও ২৫ বৎসর পর সে উপলব্ধি করে শেকড়ের টান। আর সেই টানেই গল্পকার ছুটে যান ফেলে আসা সেই পুরোনো বাংলাদেশে কিছু সুখদ স্মৃতিকে আর ও ভরাট করে নিতে।[৭৮]

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য গল্প রয়েছে যেমন --- অন্ধকারের শেষে (সপ্তজিৎ দাস), ধারাবিবরণী (সম্রাট), অচরিতার্থ (হুসেন আহমদ নুরী), মাত্রিদর্শনে (বনমালী গোস্বামী), গুণাহ্ (সঞ্জিত চক্রবর্তী), বোয়াল (সনৎ বসু), ঘাসফুল (নকুল রায়), অন্য মন (দিগ্বিজয় পাল), সুন্দর ভোরের প্রতীক্ষা (প্রতিমা ভট্টাচার্য), কফিন (যশোধীর শ্যাম) ইত্যাদি।

<u>প্রবন্ধঃ</u>

পত্রিকাটি বেশ কিছু বছর ধরে চলার দরুণ প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বেশ ধনী ছিল। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক প্রবন্ধ পত্রিকাটি বারে বারে পাঠকমন্ডলীকে উপহার দিয়েছে।

বিবর্তন ও ভারতীয় সমাজ – বসুদেব ভট্টাচার্য। - "বিবর্তন যে কতখানি প্রয়োজন ইতিহাস তার সাক্ষী দিচ্ছে। অন্যান্য সমাজও জলন্ত উদাহরণ, তবুও আমরা অন্ধের মতো অণুকরণ করছি সেই বিকৃত সমাজ ব্যবস্থাকে, যে ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল হাজার বছরের ও আগে শোষক শ্রেণির প্ররোচনায়, যাকে বিকৃত করা হয়েছিল তাদের স্বার্থে। আজকের বিজ্ঞানের যুগ, এই যুগেও যদি আমরা বিবর্তন নামক সত্যকে মেনে না নেই, যে সব মহৎ প্রাণ মানুষ পরিবর্তনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন, তাদের সংগে সহযোগিতা না করে, ধর্মের নামে শোষণ

চালিয়ে যেতে থাকি, বিবর্তনকে উপেক্ষা করি, যদি আমরা সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করি, তবে এমন একদিন আসবে যেদিন ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে গর্বিত হবার জন্য আমাদের অস্তিত্বও থাকবে না"। [৭৯]

প্রসঙ্গঃ শিল্প - কান্তিময় দেব ---- "সমাজ ও জীবন সম্পর্কে অসচেতন কোন ব্যক্তিকে যদি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' পড়তে বলা হয়তাহলে সেটা যেমন তার মননে কোন দাগ কাটবে না ঠিক তেমনি শিল্প সম্বন্ধে ন্যুনতম অভিজ্ঞতা না থাকলে একটি অতি উঁচুস্তরের শিল্পকর্ম তার কাছে অবাস্তব মনে হবে। তাই শিল্প, সাহিত্য বা কবিতার রস সংগ্রহ করতে হলে আমাদেরকে শিল্পীর অনুভূতিপ্রবণ মনের সাথে একাত্ম হওয়ার সংগ্রাম সচেতন ভাবে করতে হবে।"[৮০]

শ্রীহট্টের লোককবিতা- ডঃ দিলীপ লাহিড়ী ও ডঃ বিমলজ্যোতি দেব

"শ্রী হট্টের এই সমৃদ্ধ লোকসাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে সংগৃহীত করতে পারলে সেখানকার প্রাচীন সামাজিক চিত্রের এক সার্থক রূপ তুলে ধরা সম্ভব। চর্চার অভাবে আজ সিলেটের লোকসাহিত্য মৃতপ্রায়৷ বেশিদিন অসংগৃহীত হয়ত এদের আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। আজ ও সংগ্রহ করতে গেলে প্রাচীন লোকদের শরণাপন্ন হতে হয়৷ দেশবিভাগের পর এদেশ থেকে দক্ষ লোক সংগ্রাহক পাঠানোর প্রয়াস ও ব্যার্থ -

"উট কইলে হউরর নাম / বট কইলে ভাউরর নাম।"

যদিও শ্রীহট্টের আজ পর্যন্ত সংগৃহীত লোক সাহিত্যের ভান্ডার স্বল্প নয় তার বিস্তারিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি"।[৮১]

খাসি কবি উ শশ থাম - মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য ---- "সাহিত্য শিক্ষক হিসাবে কবি উপলব্ধি করেছিলেন খাসী ভাষায় সীমিত সাহিত্যের কথা। কবি নম্র শিরে এই মহৎ দায়িত্বের ভার গ্রহণ করেন তার স্কন্ধে। প্রথমে তার সাহিত্য সুর বিদেশী সাহিত্যের অনুসরণে এবং অনুকরণে।

তারপর কবি উপলব্ধি করেন এমনি অনুসরণে এবং অনুকরণে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। আপন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা ভাররাশি মূর্ত্ত হতে থাকে কবিতায়। অজস্র কবিতা লিখে চলেন। কবি চিরকালের মহৎ কবিদের মত বিনীতভাবে বলতেন তিনি জ্ঞানবিহীন। কবিতা 'কল্পনালতার দেহ মাধুর্য্যের ব্যাখ্যা তিনি পন্ডিতদের মত জানেন না । এমনি ধরনের কথা তার KA JINGPYNSHAI কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন। Prof. R.S.Lyngdoh Nongbri –র ইংরাজি অনুবাদ –"i do not know what an art is - Poetry. The meaning of foot, metre, rhyme, an idea appear to me like the scattered bones of the skeleton of a dead cow, because no one has ever tought me to know how to develop Khasi language & literature."[৮২]

খাসিয়া পাহাড়ে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা পর্ব- জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী।

----"খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সংগে এই পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের যে যোগসূত্রের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কররাই আমাদের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণচন্দ্র পালের পরে খাসিয়া পাহাড়ের অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম যার আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর নাম রেভারেন্ড আলেকজান্ডার লিস্ (Rev. Alexander Blish), জন্মসূত্রে আমেরিকান । তিনি ছিলেন শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট (Baptist Mission) মিশনের একজন মিশনারী। লিস চেরাপুঞ্জীতে ১৮৩২ খৃঃ ব্যাপটিষ্ট মিশনের স্থাপনা করেন। তিনিই প্রথম চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে তিনটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত করেন। একটি চেরাপুঞ্জীতে, একটি মাম্লুতে এবং অপরটি মোস্মাইতে। ----- রেভারেন্ড লিস প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হন, তা হলো শিক্ষার বাহন একটি লিপির সমস্যা। খাসিদের লোকসাহিত্য (Oral literature), তাদের লোকগাঁথা (folk tales) ছিল খুবই উন্নত এবং বৈচিত্রপূর্ণ। কিন্তু তাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না। লিস-এর বাংলা লিপির সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল।তাই সম্ভবত একটি ভারতীয় লিপি হিসাবে তিনি বাংলা লিপি গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন। বাংলা লিপি ব্যবহার করে খাসি ভাষায় তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন, the gospel of St Matthews। তার দ্বিতীয় গ্রন্থ Dr. Wall's Catechiom। তারো কিছু আগে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের সম্পাদনায় খাসি ভাষায়ও বাংলা অক্ষরে নিউ টেষ্টামেন্টের (New Testament) একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল"।[৮৩]

গুয়াহাটী নগর বিষয়ক কিছু তথ্য এবং অনুমান- কল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য

"লক্ষ্যনীয় যে, আহোম শাসনকালে রাজ্য শাসন মূলত উত্তর আসাম থেকে পরিচালিত হত। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে সে সময় গুয়াহাটি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল বলে মনে হয় না। গুয়াহাটী শহরের অভ্যন্তরে কিছু জলাভূমি ও দুইটা চলন্ত বিলের (চলবিল) অস্তিত্ব থাকায় শহরটি বসবাসের জন্যও খুব আকর্ষণীয় ছিল না। অবশ্য সামরিক দিক দিয়ে গুয়াহাটি সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এই সব জমাভূমিকে সামরিক প্রয়োজনে কাজে লাগানো হত। সেনাপতি লাচিত বরফুকনের রণতরীগুলি দিঘালীপুখুরীতে লুকিয়ে রাখা হত এবং এজন্য তখন দিঘলীপুখুরীর সংগে ব্রহ্মপুত্রের যোগ ছিল। রাজনৈতিক বাণিজ্যিক ও স্থানীয় ধর্মকেন্দ্র হিসেবে গুয়াহাটির গুরুত্ব কমে যাওয়ায় উচ্চবিত্ত ও উচ্চাকাঙ্খী লোকেরা গুয়াহাটি পরিত্যাগ করেন। ক্রমে, গুয়াহাটী শুধুমাত্র তীর্থনগরী ও সামরিক ঘাঁটি হিসেবে টিকে থাকে। এ অবস্থা চলতে থাকে বৃটিশ যুগের আরম্ভ পর্যন্ত।"[৮৪]

মেঘালয় রাজ্যের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি– সমুদ্র গুপ্ত।

সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবন্ধ সুলভ নয়। তবে এই তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধটি জনসাধারণকে মেঘালয়ের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শুধু ধারণাই দেয় না বরং সচকিত করে তোলে। "৪র্থ পরিকল্পনা কালে আলুর উৎপাদন ছিল ১ লক্ষ টন বেড়ে ১.৩৪ লক্ষ টনে পৌছোয় ৬ঠ পরিকল্পনা কালে, এবং ১৯৮৫ সালে তা হয় ১.৪১ লক্ষ টনে। কিন্তু তৈলবীজ,

পাট, মেস্তা ও কার্পাস উৎপাদন মোটেই আশানুরুপ নয়। খাদ্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মেঘালয় আজও খাদ্য ফলস উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বয়ং নির্ভর হতে পারেনি। ভূমি সংস্কার কার্যত নেই বললেই চলে। কৃষক ফলতঃ ফসলের লাভদায়ক মূল্য থেকে বঞ্চিত। গোষ্ঠীভুক্ত জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার জন্যে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত। ফলে আসল কৃষক আরো গরীব হচ্ছে। এবং বেশির ভাগেই আধিয়াকৃষক এবং কৃষিমজুরে পরিণত হচ্ছে"।[৮৫]

সর্বধর্ম সমন্বয়- আশরফী বেগম।

"পৃথিবীর অন্যতম ধর্মগুলি যথা কিছু হিন্দু, জৈন, শিখ, জোরাস্ট্রিয়ানিজম্, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলামে এই ঐশী সত্ত্বার কথা ঘোষনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বস্রষ্টার ঐরূপ অস্তিত্বের কথা স্বীকার না করলেও মনুষ্যজ্ঞানের অতীত এক পূর্ণাত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। অতএব সংক্ষেপে বলা যায় যা, ভগবান, ঈশ্বর, পরমাত্মা, এক ঔঙ্কার, আহুরা, মাজদা, god, অথবা আল্লা যে নামেই আমরা এই ঐশী সত্ত্বাকে ডাকি না কেন, সকল ধর্মই মূলত এক আসীম অনন্ত সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ------'নূরুন আল্লানূর' ---- জ্যোতিষামপি তাজ্জাতিস্থ --- অর্থাৎ জ্যোতিরও জ্যোতির প্রতি আমাদের মনকে ধাবিত করে।

হাজার হাজার বছর আগে বৈদিক মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছিল "একম্ এবম্ অদ্বিতীয়ম্।" যুগে যুগে তারই প্রতিধ্বনিশুনি Zend Avesta-র "Nist Yezdan magar Yezdan," কোরআনের অমর বাণী "লা ইল্লাহা ইল্লাহ" ------ "There is no God but He" অর্থাৎ ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। দেশে দেশে কালে কালে মহাপুরুষেরা সকল ধর্মই যে মূলত এক তার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন"।[৮৬]

এছাড়াও আরও কিছু প্রবন্ধ রয়েছে। যেমন ---ব্রহ্মপুত্রের চরে জনজীবন (কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য), জর্জআরওয়েলের ১৯৮৪(হুসেন আহমেদ নূরী), খাসি লোককথা (শোভনা ভট্টাচার্য),

জাতীয় চেতনা প্রসারের বাংলা নাটক (কৃষ্ণা পাল), শ্রীহট্টীয় লোকসাহিত্যে ধাঁধা (ডঃ দিলীপ কুমার লাহিড়ী), ডিমাসা বিবাহ রীতির ভূমিকা (অনুপমা নাইডিং), হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে (শ্যামাদাস ভট্টাচার্য), গারো ভাষাও সাহিত্যের সংক্ষেপিত রূপরেখা (মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য), ধর্ম নিরপেক্ষতা (রণজিৎ দেব) ইত্যাদি।

এ ছাড়াও রণজিৎ করের "সোভিয়েট জীবনের আর একটি দিক"–নামের ভ্রমণ বিষয়ক রচনাও রয়েছে ।

উমিয়াম (১৯৮৩ – ১৯৮৮)

পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শংকর চক্রবর্তী। মোট ৭টি সংখ্যা বেরিয়েছিল৷ পত্রিকাটি ষান্মাসিক পত্রিকা ছিল। এতে কলকাতা, কাছাড়, শিলং ও আসামের নামী লেখকদের লেখা দেখা যায়।

উময়ামের সম্পাদকীয়তে সর্বপ্রথম শিলং-এর মানুষের মধ্য দিয়ে শিলং বা উত্তর পূর্বাঞ্চলকে চিনে নেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যার। "এ অঞ্চলে এমন কিছু সমাজ বিজ্ঞানী বা অভিজ্ঞ সাধারণ মানুষ এখনও বেঁচে আছেন যাদের বহু ব্যক্তিগত তথ্য ও দিব্যদৃষ্টি আমাদের নতুন দিক্ নির্দেশে সাহায্য করতে পারে। 'উমিয়াম' এবার থেকে নিয়মিত ঐসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হবে ।"[৮৭]

পত্রিকাটির প্রায় প্রতি সংখ্যায় রয়েছে বিভিন্ন নামজাদা মানুষের সাক্ষাৎকার। যেমন – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, হেলমন খংযাই, যোগেন চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। এছাড়াও শ্রদ্ধেয় বিজয় ভট্টাচার্যের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', যা ধারাবাহিক হিসাবে প্রতি সংখ্যায় বেরুত তা শিলং-এর তৎকালীন সাহিত্য সংস্কৃতির স্মৃতি বহন

করে চলেছিল। ইতিহাস গ্রন্থনার কাজে হাত দিয়ে বিজয়বাবু নিঃসন্দেহে এক মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের গ্রন্থ আলোচনা এই পত্রিকার একটি বিশিষ্ট বিভাগ ছিল। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের কবিতার বিচার, সুকুমার বাগচী, মৃণাল বসু চৌধুরী, কমল চৌধুরীর উপন্যাস ইত্যাদি অত্যন্ত গভীরতার সংগে আলোচিত হয়েছে।

শিলং এর তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের খবরও যথাযথভাবে পত্রিকাটি সরবরাহ করে গেছে।

প্রাথমিক সংখ্যাগুলি বিষয়ভিত্তিক বিভাজিত নয়। পরবর্তীতে তা সংশোধিত হয়েছে। উমিয়াম স্বচ্ছ সুন্দর পত্রিকা। ভাষা ব্যবহারের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। একটি সম্পূর্ণ সাময়িক পত্রিকাহিসাবে প্রাধাণ্য দেওয়া চলে। তবে সেই সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরস্থিতির উপর আলোচনা নিদেনপক্ষে সম্পাদকীয়তেও মন্তব্য থাকলে বোধকরি পত্রিকাটি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারত।

কবিতাঃ

জলের বদলে (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

"জলের মাত্রা কমিয়ে দিন,
তা নইলে আপনার এই গোলাপচারা শুধু
পাতাই ছাড়বে,
কস্মিনকালেও ফুল দেবে না।"
নার্সারির ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন,
"তেষ্টায় ছটফট না করলে

মানুষই কখনও ফুল দেয় না ,

গাছের আর দোষ কী !”

তেষ্টায় ছটফট্ করতে করতে আমি

দেখতে পাই,

শুভার্থীরা তাদের জলের ঝারি থেকে

জলের বদলে

কেরোসিন ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

দেখি আর ভাবি :

কেউ একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই আমি

আগুন হয়ে ফুটে উঠতে পারব।’’[৮৮]

তোমাদের জন্য মালা--- কমল চক্রবর্তী।

* * * * * * *

একা সারাক্ষণ তোমাদের মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে

এইসব পুরনো শহর, কুকুর ধরা গাড়ি, শ্মশানবন্ধুদের মনে পড়ছে

মৃত্যুপ্রিয় বাঙ্গালী যুবতীর পোড়া মুখশ্রী

নিজের মরামুখ ভাবতে ভয় হয় তাই তোমাদের জন্য এই কেরোসিন কাঠের

তক্তপোষ

তোমাদের জন্য আকাশ আলো করা এই গন্ধরাজ মালা।[৮৯]

বিকেলের বর্ণফেরা--- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘাটের পৈঠায় বসে আছে এক জলকন্যে, এখনো হয় নি ঠিক সন্ধে
নিথর দিঘীর পিঠে মেঘের তরল ছায়া , যেন সব কথার নিষেধ
ইষৎ বাতাসে ওড়ে চুল, ভুরু, ডম্বরু কোমর খাঁজে দুটি পদ্মপাতা
মুখের ভঙ্গিঁমা তার নৈঋতে ফেরানো, যেন মুখ তার না দেখাই ভালো
বস্তুত জলের নীচে তার কোন বাস নেই, কঠিন ভূমিতে কেউ নেই
আকাশেও কিছু নেই, স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নে, এ শুধু একাকী বসে থাকা
বিকেলের বর্ণফেরা, চূর্ণ ঝড় ধেয়ে এলে সে কোথাও যাবে না থাকবে না ![৯০]

তোমার যা ইচ্ছে করো- সমীর তাঁতীর কবিতা।

(অসমিয়া কাব্য জগতে এইটি একটি অতি পরিচিত নাম। যদিও কবি অসমিয়া তবুও মাঝে মধ্যে বাংলাতেও তিনি লিখে থাকেন। 'উমিয়ামের' জন্যও তিনি একগুচ্ছ বাংলা কবিতা লিখেছিলেন। তারই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হল।)

আমি আপরাধ করেছি আপরাধী তোমার যা ইচ্ছে করো
আমার রাস্তা তুমি চেনো কোন গলির কোন মোড়ে কতকাল
দাঁড়িয়ে আছে ঘর-বাড়ি বেসরকারী
তাকে ভাঙ্গো
তোমার যা ইচ্ছে করো
কেউ কি সখ করে মায়ের কোলে শেখে প্রাচীন অপরাধের পাঠ
কালি কলম নিয়ে কখনো ফিরি করে কেউ
তোমার শহরে একবার লজ্জা বেচে বেঁচে থাকার পর

কেউ কাউকে কখনো অসহায় করেনি

শিশুদের জন্য শুধু শিশুদের জন্য

একটু ভাবো

যেদিক থেকে পারো পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ

যে কোন জায়গায় হিসেব করে রাখো কিছু খড়-কুটো কিছু সবুজ।[৯১]

এছাড়াও কিছু বেশ ভাল কবিতা রয়েছে, যেমন --- চোখ (বীরেন্দ্র নাথ রক্ষিত), দেশাত্মবোধক হাসি (স্বপন সেনগুপ্ত), চিরকালীন আমার নির্বাসিত মন (পীযূষ ধর), একটি গ্রামীণ পদ্য (তপোধীর ভট্টাচার্য), ড্রাইভারের পাড়া (কমল চক্রবর্তী), রবীন্দ্রনাথ প্রিয়বরেষু (সোফিওর রহমান্) ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু অনুবাদ।

নবকান্ত বরুয়ার কবিতার অনুবাদ, নীলমনি ফুকনের কবিতার অনুবাদ বেশ কিছু সংখ্যায়ই রয়েছে।

<u>গল্পঃ</u>

সোর্স লাইট ও পরমেশ ---- মৃণাল বসুচৌধুরী। - ভিন্ন স্বাদের আধুনিক গল্প। সাম্প্রতিক জীবনের চলমানতার মধ্যে প্রেম ও প্রত্যাশার লুকোচুরির ব্যাখ্যা এই গল্পটির প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। [৯২]

কলং তীরে হাতী---- কল্যাণ ভট্টাচার্য। - সাম্প্রদায়িকতার কদর্য মুখোশের আড়ালে এক সুন্দর জীবনের মৈত্রীর গল্প।[৯৩]

ভোরের বাগান---- কার্তিক লাহিড়ী। - আধুনিক মাত্রার গল্প। গল্পের চরিত্র এক ফুলবাগান রক্ষা করবার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারায়।[৯৪]

ফেরা---তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ সুন্দর দীর্ঘ গল্প। বড় গল্প বলা চলে। এক বিশাল তিনমহল্লা অট্টালিকার উত্তরাধিকারীর কোলকাতার দেড়খানা ঘরে জীবনপাত ও শেষে ছেলেকে প্রতিপত্তি দেখাবার জন্য গ্রামে ফেরা। কিন্তু ততদিনে জরজর অট্টালিকাও নিজের মহিমা খুইয়েছে।[৯৫]

বিপন্ন উনুন ও একটি ছুঁচো ---- কল্যাণ ভট্টাচার্য। প্লট তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিক গোষ্ঠীর আপোষের ফলে সাধারণ শ্রমিকের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। এক শ্রমিক সংসার চালাবার জন্য blood doner হয়ে পড়ে। রক্ত বেচে বাঁচার আকাঙ্খা বিশ শতকের আধুনিকতার এক পূর্ণ মাত্রা সংযোজন করেছে ।[৯৬]

বৌদ্ধ তীর্থ বিজয়নগর ------ গোপালকৃষ্ণ রায়। মৌলিক গল্প। ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ। তবে অনেক কিছুর অবতারণা একসাথে হওয়াতে কাহিনি আমেজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।[৯৭]

ছাতামাথা ---- সুবিমল বসাক। গল্পটির নামকরণ যথার্থই বলতে হবে। একটি লোক অনেক কষ্টে নাম খুঁজে পায় তাও নাম হচ্ছে ৫৫৭৪৩। ঠিক বোধগম্য হয় না। তবে মৌলিকতা এখানেই গল্পটি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত।

আমি যাকে ভালবাসি ------ দেবব্রত দাস। অসমিয়া গল্পের অনুবাদ ----- অনুবাদক কিশোর রঞ্জন ভট্টাচার্য।

৮০ দশকে সন্ত্রাসবাদী নায়ক কি ভাবে প্ল্যাটফর্মে বোমা বিস্ফোরণ করতে গিয়ে অবশেষে নিজের প্রেমিকাকেই হত্যা করে বসে। [৯৮]

<u>প্রবন্ধঃ</u>

খাসি জাতির উৎপত্তি - কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা ---- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী।

এক অনুপম প্রবন্ধ। যথেষ্ঠ গবেষণার নিকর্ষ হচ্ছে প্রবন্ধটি। ----"এরপর খাসিদের ভাগ্যগণণা পদ্ধতি লক্ষ্য করে দেখা যাক্। ডিম ভাঙ্গা, মৃত মুরগী বা অন্যান্য জন্তুর যকৃত ও

অন্ত্র পরীক্ষা এবং মাটিতে চাল, অন্য শস্য ও কড়ি ফেলে ভাগ্য গণণা খাসিরা করে থাকে। এগুলো সবই অষ্ট্রিকপ্রথা। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডিম ভাঙ্গার ব্যাপারটি। এই ডিম ভেঙ্গে ভাগ্য গণণার রীতি এবং বর্মার পলাউনিংদের (Palauning) রূপকথাতে ডিমের গুরুত্ব, এই দুটি ব্যাপারের সাদৃশ্য গর্ডন লক্ষ্য করেছেন। ডিম ভাঙ্গাটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, মুখ্য হচ্ছে একটি জাতির জীবনদর্শনে ডিমের গুরুত্ব। খাসিরা ডিমকে বলে 'খুন কা ব্লেই' অর্থাৎ দেবীর সন্তান; এবং এর থেকে তাদের সামগ্রিক জীবনদর্শনে ডিমের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, পলিনেশীয়দের রূপকথায় আছে যে দেবতা 'ট্যাঙ্গাঁলোয়া (Tangaloa)' একটি বিশাল ডিম ভেঙ্গে স্বর্গ, মর্ত্য ও ছোট ছোট টুকরোগুলো থেকে দ্বীপপুঞ্জসৃষ্টি করেন। হিন্দু দর্শনে ব্রহ্মান্ডের (ব্রহ্ম + অন্ড অর্থাৎ ডিম) যে ধারণা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে অষ্ট্রিকদের কাছ থেকে নেওয়া এববগ পলিনেশীয়দের জীবনদর্শনের সাথে এর যথেষ্ঠ মিল আমরা খুঁজে পাই। বৃক্ষরূপ আত্মা এবং অরণ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা খাসিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'পবিত্র অরণ্য' প্রায় প্রত্যেক খাসি গ্রামের কাছাকাছি পাওয়া যায় এবং এই প্রথাটি মুন্ডাদের মধ্যেও বিশেষভাবে প্রচলিত"।[৯৯]

***বাবু জীবন রায় ও খাসি সমাজে নবজাগরণ*-----** জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য।

বাংলা সাহিত্যের পুরোধা যেমন রামমোহন ঠিক সেভাবেই খাসি আধুনিক সাহিত্যের জনক বলা যেতে পারে এই বাবু জীবন রায়কে। বাবু জীবন রায় সম্পর্কে রচিত এই প্রবন্ধের প্রয়াস বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রবন্ধটির কিছু ছত্র ------ "বাংলা হরফ বদলে রোমান হরফ চালু করাটা বাবু জীবন রায়ের অপছন্দ ছিল। তিনি দুটো হরফেই বই লিখেছিলেন। ওয়েলশ মিশনারীরা বাংলা হরফ বর্জন করার ছয় দশক পরেও তিনি বাংলা হরফে খাসি বই লিখেছিলেন। আসলে বাবু জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানই ছিল সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির জগতে। বলা যেতে পারে তিনিই হলেন আধুনিক খাসি সংস্কৃতির জনক। তাঁর

প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর জন্যে প্রাইমার তিনি নিজেই লিখেছিলেন। মিশন স্কুলের প্রাইমারে তখন থাকত খাসি ও ভারতীয় উপকথা। তার 'কি নিয়াস জং কি খাসি', যা ১৮৯৭ খৃঃ প্রকাশিত হয়, তা খাসি ধর্মের উপর এক সুচিন্তিত আলোচনা গ্রন্থ। এই বইয়ের ভূমিকায় তিনি শিক্ষিত খাসিদের কাছে আবেদন করেছিলেন তাদের অতীত ঐতিহ্যকে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে, রক্ষা করতে"।[১০০]

নাগা উপজাতির কাঠখোদাই---------- উমা বাগচী।

অত্যন্ত মৌলিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি আগ্রহের উদ্রেক তো করেই উপরন্তু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। "বীরত্বের ব্যঞ্জনায় তো নরমুন্ডের মালা গলায় ধারণ করা যায় না। শিল্পী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কাঠের নরমুন্ড তৈরি করে। নাগা বীরেরা বীরত্বের প্রতীক হিসেবে কাঠের খোদাই করা ছিন্নমস্তক গলায় পরতো। বীরত্বের প্রতীক হিসাবে কাঠের তৈরি নরমুণ্ড বীরের গলাতেই থেমে রইল না। নাগাবীরের চুল বাঁধার উপকরণেও দেখা দিল ছিন্নমস্তক। গ্রামের প্রধানের বাড়ি কি দিয়ে সাজানো ? সেখানেও শোভা পেল নরমুণ্ড। যুবসমাজের প্রাণকেন্দ্র মোরাং নরমুণ্ডে সজ্জিত হয়ে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। দিকে দিকে কাষ্ঠমুণ্ডের দারু ভাস্কর্য দেখে আমাদের অনুমাণ করতে অসুবিধা হয় না, নাগা শিল্প ও সংস্কৃতির উৎস এই head hunting অর্থাৎ যার উৎস ছিল হিংসায় এবং পরিসমাপ্তি ও ব্যাপ্তি ঘটলো বলিষ্ঠ দারু ভাস্কর্যে। এই শিল্প শুধু গলার মালায় আর মোরাং এর সাজে আটকে রইল না, ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে। অলংকার, ধূমপানের পাইপে, পানীয় পাত্রে, 'দাও' এর খাপে, গৃহসজ্জা ও মূর্তিতে তা প্রচলিত হলো। অর্থাৎ যা ছিলো জয়ের প্রতীকতা ছড়িয়ে পড়লো নানা ভাবে নানা দিকে"।[১০১]

আর কি দ্যাখো তুমি---- বীরেন্দ্র নাথ রক্ষিত।

শুধু কবি হিসাবেই নয়, প্রাবন্ধিক হিসেবেও বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ছিলেন এক উজ্জ্বল নাম। এই প্রবন্ধ তাঁর বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতার মুদ্রিত রূপ। সে যাই হোক, এ হেন শিক্ষণীয় গবেষণিক বিস্তৃত বক্তৃতা প্রবন্ধের আকার প্রাপ্ত হলে ও তার মান এতটুকু নামেনি। এখানে প্রাবন্ধিক উৎপল কুমার বসুর কবিতা সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং প্রসঙ্গের অবতারণা করতে গিয়ে কাব্যে রিয়েলিটি ও সিম্বলিজম্ এর এক সুনিপুণ ব্যাখ্যাও করেছেন । ---"রিয়েলিটি আর তার দ্বান্দ্বিক সমাজ সম্পর্ক বা রিলেশন্‌শিপের সূত্রেই তবে ইমেজিষ্টদের ব্যবহৃত আতসকাঁচ শ্লেষবিদ্ধ আর তির্যক প্রতিফলিত হয়ে ওঠে কম্পোজিশন। তা হলে পাখির ধড়টাই দেখবো, না শুধু চোখ --- সেই তর্কে, আপাতত সুস্থির ও অতিক্রান্ত আমরা, জানি, জেনেছি, তার আদি প্রেরণাসূত্রের উৎসস্বরূপ যে উনিশ শতকীয় ফরাসি সিম্বলিষ্টদের। স্বচ্ছ জলের উপর প্রতিচ্ছায়ায়, পাখির নয়, মাছের চোখ লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ার সেই মহাভারতীয় কৌশল--- কতোকাল পরে আরেকবার আমাদের মনে পড়ে । পর্যবেক্ষণ শক্তির এই আর্কেটাইপ, অতঃপর, কতো ঘাট পেরিয়ে বস্তু ও বস্তুসত্তার বিভেদজনিত চূড়ান্ত সোরগোলের মুহূর্তেই, হয়ে ওঠে আরো আধুনিক শিল্পতত্ত্ব। হাতে নাতে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার আধুনিক শিক্ষাটা আসে কি না অগত্যা ফরাসী সিম্বলিষ্ট্‌দেরই কাছ থেকে"।[১০২]

কবিতা বিষয়ে দুটি ভাবনা------ অশ্রুকুমার সিকদার।

কবিকে কবি থাকতে দেওয়াই উচিত। কাফে-এর করতালি, পাঠকদের হট্টগোলের মাঝে কবির কবিত্ব চলে গিয়ে ব্যক্তিটাই বড় হয়ে ওঠে। আর এই অকুণ্ঠ প্রশংসা, সম্মান-এর চাপে পড়ে কবির কবিত্ব ম্লানিমা গ্রস্ত হয়ে পড়ে বলে প্রাবন্ধিকের বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত কবির মন স্রষ্টার মন। ফলে দেশজাত ভাষা ভিন্ন হলেও বিষয়ীভূত মিল কবিদের থেকেই যায়। এ প্রসংগে

কিছু লাইন আমরা তুলে ধরছি - "পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকেন দুই কবি। কেউ কারো ভাষা বোঝেন না। তবু কোন অলৌকিক পদ্ধতিতে যেন প্রায় একই কথা দুজনের কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি Gitanjali-র "My song has put off her adornment. She has no pride of dress and decoration. Ornaments would mar our union; they would come between thee and me; their jingling would drown they whisper." এই অংশের প্রতিধ্বনি শুনি ১৯১৬ সালে লেখা হিস্পানী কবি হিমেনেথের Entermidades কাব্যের –

Then she took to adoring herself
With all sorts of finery
And I hated her her not knowing why ……..
But once more she began undressing
And I smiled upon her
* * * * * *
And she took off her slip, too
And appeared quite naked …….
Oh naked poetry, my lifelong passion,
Now you are mine forever!

লাইনগুলিতে এবং ইয়েটসের 'A Coat' কবিতায়৷ এই সাদৃশ্যগত যোগাযোগ এখানে ঘটেছে নিশ্চিতভাবে প্রভাবজনিত কারণে। ১৯১২ সালে প্রকাশিত Gitanjali জনপ্রিয়তার এক ঝড় তুলেছিল ইউরোপের ভূখন্ডে। ইয়েট্স তো এই কাব্যের প্রকাশচেষ্টার সংগে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন৷ আর হিমেনেথ রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ইংরেজিঅনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন স্ত্রী থেনোবিয়ার মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে হিমেনেথ ও থেনোবিয়ার পূর্বরাগে রবীন্দ্র রচনা পালন করেছিল কন্দর্পের ভূমিকা"।[১০৩]

এছাড়াও বেশ কিছু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যায়ই দেখতে পাওয়া যায়। খাসিদের মাতৃ অনুসারী সমাজে (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী), পৃথিবী নামক একটি আশ্চর্য মহাকাশযান (অভীক গুপ্ত), রবীন্দ্র নাট্য প্রযোজনার পুনরুজ্জীবন : কালের যাত্রা (বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত), ওয়ারুদের দেশে (সুনির্মল দত্ত চৌধুরী), কর্‌করে নতুন কথা (দেবাশিস তরফদার) ইত্যাদি।

কর্মশালা (১৯৯০ থেকে এতাবদ্)

শিলং বঙ্গীয় সাহিত্যের মুখপত্র এই পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক হিসাবে বেরোনো শুরু হয়েছিল। এতাবদ্ পত্রিকাটি মোটামোটি সেই ধারারই অনুবর্তন করে চলেছে৷ বর্তমানে এতে পুরানো অনেকের রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে৷ এ ছাড়াও শিলঙের বিদগ্ধ লেখক ও কবি মন্ডলীর রচনা তো রয়েইছে।

'কর্মশালা' এক সাহিত্য আড্ডা হিসাবে জন্মগ্রহণ করলেও কালে সেই আড্ডায় যে সমস্ত সাহিত্যকীর্তি পঠিত হত তা এক পত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে কালক্রমে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র হিসাবে এতাবদ চলে চলেছে। প্রথম সংখ্যার ঠিক হদিশ পাওয়া না গেলেও তাদের হীরকজয়ন্তী সংখ্যায় সাহিত্য পত্র প্রকাশের কাল ও সম্পাদকের যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল তা পুনমুদ্রিত হলো। পত্রিকাটির বিশিষ্টতার কথা তার সম্পাদকীয়তে এভাবে বলা হয়েছে --- "কর্মশালা রবীন্দ্রমন্ত্রে বিশ্বাসী।"[১০৪] তাই পত্রিকাটির বেশিরভাগ সংখ্যাই রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে। বিশেষতঃ বৈশাখ সংখ্যা আজ অবধি রবীন্দ্র বন্দনায় মুখর থাকে। তবে অন্যান্য রচনাও পত্রিকাটির অন্তর্ভুক্ত হয়। বিগত এক দশক ধরে এঁরা বিভিন্ন বিষয়কে বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করে চলেছেন। যেমন প্রয়াত বিজ্ঞান শিক্ষক এস্ এন দাশ সংখ্যা , রবীন্দ্র সার্ধ শতবর্ষ সংখ্যা, লিট্‌ল ম্যাগাজিন সংখ্যা ইত্যাদি।

‘কর্মশালা’য় প্রবীণদের সাথে নবীনদেরও সমসুযোগ দেওয়া হয় বলে বর্তমান প্রজন্মের বহু নবীন লেখকদের রচনা এই পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই দেখা যায়। রচনার মান দেখলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সম্পাদকমন্ডলী রচনা চয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকেন।

গবেষণার কালসীমার পটভূমিতে বিচার করলে ‘কর্মশালা’য় সেরকম মননিষ্ঠ প্রবন্ধ যা পূর্বাপর সাময়িকীতে রয়েছে ---- তেমন আর দেখা যায় না। যে সমস্ত রচনা রয়েছে তাকে প্রবন্ধ না বলে নিবন্ধ বললেই উপযুক্ত হয়। তবে বর্তমান প্রজন্মে এ কথা মনে রাখতে হবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রতিচ্ছবির আধারেই সাহিত্য রচিত হয়। সেইজন্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা সমস্তই এই পত্রিকায় বর্তমানের ছায়াপাত রয়েছে। অভিনব বিষয়ের সমাহার রয়েছে । যেমন – ইন্টারনেট, হোস্টেল ইত্যাদি। প্রবন্ধের বিষয় হয়ে দাড়াচ্ছে ট্রাকের পিছনে লেখা লাইন সমুহ ।

প্রথম দিকের সংখ্যাগুলোতে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন দেখা যায়। প্রায় সমস্ত বিজ্ঞাপনই ইংরাজিতে। পরবর্তী সংখ্যায় তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধুমাত্র বিশেষ কোন সংখ্যা বেরুলে তাতে কিছু বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে।

কিছু কিছু সংখ্যায় ভ্রমণ কাহিনি ও দু একটি রম্য-রচনাও রয়েছে। রয়েছে পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ। আরম্ভের কিছু সংখ্যায় পৃষ্ঠা নং ও সূচিপত্র দেখা যায়নি। কিন্তু এখনের সংখ্যা সে সমস্ত ত্রুটিমুক্ত হতে পেরেছে এবং একমেবদ্বিতীয়ম্ পত্রিকা হলেও পত্রিকাটি প্রশংসার্হ। সম্পাদকের তালিকা দেওয়া হয়েছিল তা পুনমুদ্রিত হলো।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'কর্মশালা'র এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন সংখ্যার তালিকা সম্পাদকের নামসহ

ক্রমিক নং			সাল	সাময়িকীর নাম	সম্পাদকের নাম
১।	শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র	—	১৩৯৮	কর্মশালা (২য় ও ৩য়)	মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য
২।	"	—	১৩৯৮	কর্মশালা (বর্ষপূর্তি)	যশোধীর শ্যাম চৌধুরী
৩।	"	—	১৩৯৯	২য় বর্ষপূর্তি	শিবতোষ ভট্টাচার্য
৪।	"	—	১৩৯৯	নববর্ষ সংখ্যা	ড০ শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য
৫।	"	—	১৪০০	কর্মশালা	রণজিৎ সরকার
৬।	"	—	১৪০০	কর্মশালা	পীযূষ ধর
৭।	"	—	১৪০১	কর্মশালা	মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য
৮।	"	—	১৪০১	বর্ষপূর্তি	প্রণব কুমার সেন
৯।	"	—	"	একাদশ সংখ্যা	প্রণব কুমার সেন
১০।	"	—	"	দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ	দেবাশিস চক্রবর্তী
১১।	"	—	১৪০৪	কর্মশালা	পীযূষ ধর
১২।	"	—	"	ষোড়শ সংখ্যা	পীযূষ ধর
১৩।	"	—	১৪০৬	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী স্মরণ সংখ্যা	পীযূষ ধর
১৪।	"	—	১৪১০	কর্মশালা	পীযূষ ধর
১৫।	"	—	১৪১১	১২ বছর ৪র্থ সংখ্যা	পীযূষ ধর
১৬।	"	—	১৪১১	১৩ বছর ১, ২, ৩ ও ৪র্থ সংখ্যা	ড০ শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য
১৭।	"	—	১৪১২	কর্মশালা	ড০ শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য
১৮।	"	—	১৪১৩	কর্মশালা	ড০ শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য
১৯।	"	—	১৪১৪	৪র্থ সংখ্যা কর্মশালা	পীযূষ ধর
২০।	"	—	১৪১৪	১ম - ৩য় সংখ্যা	সংযুক্তা দাস পুরকায়স্থ
২১।	"	—	১৪১৫	কর্মশালা	সংযুক্তা দাস পুরকায়স্থ
২২।	"	—	১৪১৬	ডারউইন দ্বিশত জন্মবার্ষিকী সংখ্যা	সংযুক্তা দাস পুরকায়স্থ
২৩।	"	—	১৪১৭	কর্মশালা	সংযুক্তা দাস পুরকায়স্থ
২৪।	"	—	১৪১৮	রবীন্দ্র জন্মসার্ধশতবর্ষ সংখ্যা	সংযুক্তা দাস পুরকায়স্থ
২৫।	"	—	১৪১৮	কর্মশালা	প্রণব কুমার সেন
২৬।	"	—	১৪১৯	২০ বছর ৪র্থ সংখ্যা	প্রণব কুমার সেন
২৭।	"	—	১৪১৯	২১ বছর কর্মশালা	সংযুক্তা দাস পুরকায়স্থ
২৮।	"	—	১৪১৯	২১ বছর ১, ২ ও ৩য়	সংযুক্তা দাস পুরকায়স্থ

কবিতাঃ

ম্যাজিক ------ উদয়ণ ঘোষ।

আমি স্বপ্ন দেখতাম ধানক্ষেতের পাশে

শিয়রে বন্দুক নিয়ে শোব,

সেই স্বপ্ন আমার সফল হয় নি,

তার প্রথম কারণ, আমার নিজস্ব কোন ধানক্ষেত ছিল না,

আর দ্বিতীয় কারণ বন্দুক কেনার পয়সা কোনদিন জোটাতে পারিনি।

* * * * * * *[১০৫]

আয়নায় নিজের মুখ-----শৌভিক দত্ত।

* * * * * *

শিরায় সমস্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে দুরন্ত বাতাসে,

অস্থির ধমনীগুলো চেপে ধরি প্রচন্ড ঘৃণায় .....

সারারাত পুড়ে যাই , অন্তহীন বিষের দহনে।

দেওয়ালে সাজানো ওই আয়নাটাকে

ভেঁঙ্গে দাও বড় সত্য কথা বলে !

ভেঁঙ্গে দাও ------ আমার কষ্ট হয়, কষ্ট হয়,

ভীষণ কষ্ট .....[১০৬]

কুহেলিকা--- সংযুক্তা দাশ পুরকায়স্থ।

ভোরের কুয়াশা কেটে গেলেই

জীবনের ছেঁড়া চটিতে পা

গলিয়ে বেরিয়ে পড়ব রাস্তায়

স্মৃতি, তুমি কি সংগী হবে ?

* * * *[১০৭]

গান্ধারীর অভিশাপ-------মীরা রায়।

বুকের খাঁচায় লৌহজালিক

আবৃত বুঝি অলিন্দ নিলয়।

অবনতশির জন্মদাত্রীর

অন্ধ দুচোখে ধিক্কার কজ্জল।

শবদাহে নয় জীবন্ত নরদাহে

শেষ যাত্রায় শ্মশান উল্লাস

ছিন্নভিন্ন শরীরী নারীরা

অজাত শিশুর অনল আহুতি।

* * * *[১০৮]

এছাড়াও আরও কিছু কবিতা রয়েছে। যেমন --- আবিষ্কার (পৃথ্বীশ চক্রবর্তী), ত্রিশঙ্কু হৃদয় (দেবাশিস চক্রবর্তী), পারে না শব্দময় সূর্য হতে (পীযূষ ধর), মমতাময়ী (জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়), মহাবিদ্যা (রামকিশোর ভট্টাচার্য), দখল (মঞ্জুশ্রী ঘোষ), দিদিমার পাঁচালী (দিপালী চক্রবর্তী), স্মৃতিকে (মীরা রায়) ইত্যাদি।

<u>গল্পঃ</u>

সমন্বয়-------- উমা পুরকায়স্থ। প্রাচীনপন্থী হেডমিসট্রেস মণিকাদির জ্ঞানোদয় হয় যখন সেই কুসংস্কারের ধাক্কা এসে পড়ে তার ব্যক্তিগত জীবনে। শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস

করতেন বিধবা হওয়া নারীরই ত্রুটি। বিধবারা সমাজে ব্রাত্য। কিন্তু আজ জীবনের সেই অবস্থায় যখন নিজে পড়লেন তখন তার উত্তরণ ঘটল কুসংস্কারের এই বদ্ধ আবহাওয়া থেকে। যুবতী বিধবা অতসী যে একদিন তার কাছে ব্রাত্য ছিল সেই হয়ে দাঁড়ালো তার পরম প্রিয়। নিজের যন্ত্রণার আয়নায় তিনি চিনে নিলেন অতসীর ব্যাথাকে।[১০৯]

অনুভব ----------অনিতা দে। ভাড়াটে হওয়া সর্বদাই দুঃখের। বিশেষত পাহাড়ী মালিক তদুপরি সাম্প্রদায়িকতার জালে আটকানো, নিজেকে বিশেষ মনে করা এমন মালিকের ভাড়াটে হওয়ার দুর্ভোগ এই কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে।[১১০]

ইন্টারনেট ------- সংযুক্তা দাশ পুরকায়স্থ। আজকের যুগে ইন্টারনেটের দরুণ চেনা মানুষ যখন সামনে আসে তখন অনেক আচেনা খবর বেরিয়ে পড়ে। যদিও এই কাহিনির সমাপ্তি মিলনাত্মক। তবুও এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে নেট – এ যাকে চেনা যায় ব্যক্তিগত জীবনে সে অনেকটাই ভিন্ন। মৌলিক গল্প।[১১১]

শান্তিনীড় ----- যশোধীর শ্যাম। কর্তব্যরত পুলিশের চাকরীতে পুত্র অনির্বাণ প্রাণ হারালে পিতা অভিশান্ত বাড়ির নাম বদলে অনির্বাণ করতে ইচ্ছুক হন। রবীন্দ্র প্রত্যয়ে বিশ্বাসী হয়ে অভিশান্ত যে বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'শান্তিনীড়' আজ সেই পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা করতে গিয়ে তার নিজের একমাত্র পুত্র শহীদ হয়ে গেছে। তাই এই জগতে 'শান্তিনীড়'-এর জায়গায় 'অনির্বাণ' হয়ে জ্বলে উঠাই বোধহয় সঙ্গত।[১১২]

ভোর----ধনঞ্জয় চক্রবর্তী। - এক আদিবাসী মেয়ের জীবন যুদ্ধের গল্প।[১১৩]

প্রতিবাদ ----- সুবর্ণ মুখোপাধ্যায়। - এক গৃহিপালিত স্বামীর নীরব প্রতিবাদ স্ত্রীকে ডিভোর্সের কাগজ পাঠিয়ে দিয়ে। অভিনব প্লট।[১১৪]

জীবনসন্ধ্যায় ------ মালবিকা বিশারদ। বৃদ্ধাশ্রমের গল্প। জন্মদাত্রী মা আজকে সফল ছেলে ছেলে-বৌয়ের জীবনে বোঝা মাত্র। সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র।[১১৫]

<u>প্রবন্ধঃ</u>

বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা ------ মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য।

উত্তর পূর্বীয় বাংলা ভাষা বিশেষত শ্রীহট্টীয় ভাষার উৎস ও উৎপত্তি সম্পর্কে এক অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। ------ "ভাষা শাস্ত্রের অন্যতম সূত্র হচ্ছে -- উচ্চতর-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষা সহজভাবে বিস্তার লাভ করে প্রাধাণ্য অর্জন করে। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে মাগধী প্রাকৃত প্রথমে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। পশ্চিম মাগধীতে সুপ্ত থাকে ভোজপুরী-মাগহী-মৈথিলী ইত্যাদি। পূর্ব মাগধীতে সুপ্ত থাকে ওড়িয়া-বাংলা-অসমিয়া ভাষা। সুতরাংবাংলা-অসমিয়া-ওড়িয়া; পশ্চিম মাগধী জাত পূর্বীহিন্দির বিচ্ছেদ সুপ্রাচীন। কিন্তু শ্রীহট্টীয় উপভাষা যাকে বাংলা ভাষার উপভাষা বলা হয়, তার সঙ্গে পূর্বীহিন্দির ক্রিয়াপদের মিল নিঃসন্দেহে একটি ঘটনা।শ্রীহট্টের প্রচলিত ভাষায় এইধরনের ক্রিয়াপদের এবং অন্যান্য শব্দের উদ্ধৃতি :-

শ্রীহট্টীয় প্রশ্ন : কিতা কররায় ?(কি করছো?)

উত্তর : বই ফড়িয়ার (বই পড়ছি),'কররায়' এবং 'ফড়িয়ার' এই দুই ক্রিয়াপদের সাথে হিন্দির যথাক্রমে কর-রহা এবং পড়-রহা অত্যন্ত নিকটবর্তী"।[১১৬]

প্রাগিতিহাসে পূর্বোত্তর ভারতের ভূমিকা------ অভিজিৎ চৌধুরী।

প্রবন্ধটি কয়েকটি পর্বে ধারবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। যথেষ্ঠ মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। ------"নেয়ান্ডার্থেল্-রা পাথরের যে সব ফলক বা ছুরি তৈরি করত তাতে সুন্দর আকার দেওয়ার চেষ্টা করত। ক্রোমেনীয়-রা পাথরের ছুরির বাঁটে কখনও বাইসন, কখনো বলগা হরিণ আবার কখনো ঘোড়ার প্রতিকৃতি খোদাই করত নানা ভঙ্গিমায়। এছাড়া হরিণের শিঙ ও ম্যমথের

দাঁতের ওপরেও তারা খোদাই করত জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতি। এ ধরনের উৎকীর্ণ ভাস্কর্য পাওয়া গেছে ফ্রান্সের লা-ম্যাদেলিন্ ও ব্রনিকেল ঘাঁটিতে এবং ইউরোপের অন্যত্র"।[১১৭]

যে সিনেমা এখনো দেখিনি-----প্রতিমা ভট্টাচার্য।

গণমাধ্যমকে সচেতন করার যে দায়িত্ব সিনেমার থাকে, তা থেকে আজ মনোরঞ্জনই বড় হয়ে উঠেছে। মহান শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন ও তার মানবদরদী মন সচেতন সত্ত্বা অনেক কষ্ট ও ঝড় স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু তবুও জাতীয়তাবাদের নামে স্বৈরাচারকে কখনই মেনে নেননি। সেই মহান শিল্পী ও আজকের যুগের চিন্তাহীন বস্তাপচা মনোরঞ্জনের নামে কলঙ্ক ---- সিনেমাই এই প্রবন্ধের বিষয়। -----"সত্যপ্রকাশ করার অনেক ঝুঁকি আছে। খ্যাতি হারানোর ঝুঁকি, রোজগার বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি এমনকি প্রাণনাশেরও ঝুঁকি। জনপ্রিয়তা ও অপরিমেয় অর্থ রোজগারের পরেও চার্লি চ্যাপলিন ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং প্রচুর খেসারৎ দিয়ে তাঁকে আমেরিকা থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, এমনি জোরালো ছিল তার প্রতিবাদের মাধ্যম। ..... আক্ষেপ এখানেই । আমাদের সিনেমা এই ব্যস্ত-বাগীশ সময়ের যথার্থ নির্মাণে এগিয়ে আসছে না। একুশ শতকের সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি আঠারো শতকের পচা কাহিনির পুনরাগমণ, বৈধব্যের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু।"[১১৮]

হে নূতন, দেখা দিক আর বার ------ রজতকান্তি দাস।

বিবর্তনবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ। ------"বিবর্তনবাদ আমাদেরকে প্রকৃতির ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ধারণা দেয় এবং একই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় যে বিশ্বব্রহ্মান্ডে কোন কিছুই শ্বাশ্বত বা সনাতন নয়। পরিবর্তনই প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতি প্রাণীজগৎ বা সমাজ, সবই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন আমাদের পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কা করে না । এই পরিবর্তনকে যদি আমরা মন থেকে গ্রহণ করতে না পারিতা হলেও পরিবর্তন হবেই।তাই স্থবির মন ক্রমশঃ তার পরিবর্তিত

পারপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে দুঃখ পায়। প্রগতিশীল মন পরিবর্তনকে গ্রহণ করে তার মধ্য থেকে জীবনের রস আস্বাদন করে। তাই কবিগুরু বলেছেন ---------- "রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে। আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে। "আবার ইংরেজ কবি টেনিসন বলেছেন ----"The old order yielding place to new. And God fulfils himself in many ways. Lest one good custom should corrupt the world." কবি সঠিক ভেবেছেন যে কোনকিছুই এত ভাল নয় যে তার আর পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কাজেই ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে উত্তরণ, এটাও বিবর্তনেরই ফসল"।[১১৯]

বিনা স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা ------- কল্পনা চৌধুরী।

এই বিশ্বায়নের যুগে যেখানে ইংরেজির দাপট অপ্রতিরোধ্য প্রাচীর তুলে আজ দাঁড়িয়ে, সেখানে মাতৃভাষার বিপন্নতা ও তার থেকে মুক্তির উপায় দেখাবার প্রয়াস এই প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়। ------ "মাতৃভাষা সুরক্ষায় সচেষ্ট হওয়া। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অভিযোগ এ স্থলে একেবারেই কিন্তু নয়। বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি আজ প্রয়োজনের ভাষা, বিশ্বের ভাব আদান-প্রদানের ভাষা। তবে মাতৃভাষার বিকল্প কিন্তু নয়, আর হতেও পারে না। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কথায় ----- 'নানান দেশের নানান ভাষা

বিনা স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা ?'

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ মাতৃভাষা চিন্তারভাষা, ভাবনার ভাষা, প্রাণের ভাষা। অন্য সব ভাষার পারদর্শীতায় কিন্তু এ রিক্ততা পূরণ হয় না। একথা সর্বজনস্বীকৃত"।[১২০]

অন্যান্য আরও কিছু ভাল প্রবন্ধ, যেমন --- সমাজ-সংস্কৃতি সভ্যতা (সত্যব্রত চক্রবর্তী), শিলং-এর বাংলা থিয়েটারের কথা (আফজল হোসেন), ভূমিকা শিলং (কল্পনা রায়), বাহন আ-মরি মা বাংলা ভাষা (মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য), শৈলশহরে রবীন্দ্রনাথ (উমা পুরকায়স্থ), কঠিনেরে ভালোবাসিলাম (দেবশক্তি দত্ত) ইত্যাদি।

বেশ কিছু স্মৃতিচারণ চোখে পড়ে। যেমন – স্মৃতির পাপড়ি মেলে (ছবি গুপ্তা, পরিষদ স্মৃতি), সুধীন্দ্র নাথ পালঃ মানুষ ও শিক্ষক (সুলেমান ফিরদৌসী), স্মরণ-স্মরণের বালুকাবেলায় (কল্পনা চৌধুরী)।

<u>গারো পাহাড় থেকে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্র</u>

গারো পাহাড়ের বিভন্ন জায়গা থেকে প্রকাশিত সমস্ত পত্রিকাই কিছু সাহিত্যপ্রেমীর অকুণ্ঠ প্রয়াসের ফসল। তবে সমস্ত পত্রিকাই সুভ্যেনিরের আদলে পূজোর মরশুমে প্রকাশিত হোত। তবে অনেক পত্রিকাই দ্বিমাসিক ও ষান্মাসিক ছিল ও সাহিত্য সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল বলে পত্রিকাগুলিকে সুভ্যেনির বললে পত্রিকার অসম্মান করা হয়। সুদূর ভারতের উত্তর পশ্চিম কোণে কতিপয় সাহিত্যপ্রেমীদের এই অনলস ও পরিশ্রমী প্রয়াস বাংলা সাহিত্যের প্রতি এ হেন ভালোবাসা সকলকে মুগ্ধ করে। 'মিলন' পত্রিকাটি বিগত ৩০ বৎসর ধরে সাহিত্যের সেবা করে চলেছে। গারো পাহাড়ের পত্র পত্রিকা সম্পর্কে কবি সম্পাদক শ্রী বিশ্বজিৎ নন্দীর উক্তি প্রণিধাণযোগ্য ----"গারো পাহাড়ে বাংলা ভাষাভাষীরা বাস করে আসছেন বহুদিন। এখানে আছে বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র পরিবেশ । এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য সাহিত্যপ্রেমী। আছেন প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিবান কবি, সাহিত্যিক। গারো পাহাড়ের তুরা, ফুলবাড়ি, ডালু, মহেন্দ্রগঞ্জ ও টিক্রিকিল্লা শহরগুলোতেই প্রধানতঃ বাঙালির বাস ও সাহিত্যের চাষ। এই শহরগুলো নিয়েই বাংলা পত্র-পত্রিকা, তথা সাহিত্যচর্চ্চা এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ড। সাহিত্য

কর্মকান্ড বা চর্চ্চা বলতে কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনকেই আমি বুঝি । এই অঞ্চলেই কখনও কখনও গারো পাহাড়ের কবিদের নিয়ে বসে কবি সম্মেলন, কখনো বসে কবিদের আসর । কখনো বসে সাহিত্যের আড্ডা"। [১২১]

অভিযাত্রী (১৯৭৮-৮৫)

সম্পাদক ছিলেন বিপ্লব বোস। পত্রিকাটির বেশ সুনাম ছিল বলে জানা যায়। তার একটি সংখ্যাও হস্তগত না হওয়ার দরুন কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

যুগদর্পন (১৯৭৯ – ১৯৮৯, ১৩৯৫)

তুরা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা। প্রায় দশ বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। দশ বৎসরে মোট ১৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন কমল সাহা। বেশ কিছু ভাল গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পত্রিকাটি উপহার দিয়েছে। প্রাথমিক ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক থাকলেও ধীরে ধীরে তা ষান্মাসিক ও কালে অনিয়মিত পত্রিকা হিসাবে প্রয়াণ লাভ করে।

সম্পাদক কমল সাহা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কবিদের অন্যতম। কবিতার ক্ষেত্র তাঁর পত্রিকায় ব্যপ্তি লাভ করবে, এ বলাই বাহুল্য। 'যুগদর্পণে' প্রায় প্রতি সংখ্যায় কবিতার আধিক্য দেখা যায়। প্রত্যেকটি কবিতাই রুচিকর।সমস্তই আধুনিক কবিতা। তবে কবিতা চয়নের ক্ষেত্রে সম্পাদকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সদা জাগরুক ছিল এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। এই পত্রিকার ক্ষেত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য অনুবাদ কবিতাবলী। প্রত্যেকটি সংখ্যায় যথেষ্ট অনুবাদ কবিতা রয়েছে। নেপালী কবি পদম ছেত্রী, অসমিয়া কবি সমীর তাঁতী, প্রখ্যাত গারো কবি দিওয়ান সিং রংমুটির কবিতা, কোচদের গান, ইত্যাদি এই পত্রিকায় স্থান লাভ করেছে। সাময়িক পত্রিকায় কবিতা থাকা অতি সাধারণ বিষয় – কিন্তু এই পত্রিকায় এই সমস্ত অনুবাদ কবিতা যা সাহিত্যপ্রেমী

বাঙালি পাঠককে অন্যজাতির ভাব-ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করতে সাহায্য করে। এইখানেই পত্রিকাটির সার্থকতা।

কিছু গল্প রয়েছে । তবে দু-একটি ছাড়া বাকী গল্প রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি অতি দরিদ্র। কোন কোন সংখ্যায় একটিও প্রবন্ধ দেখা যায় না।

যুগদর্পণে মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে। যদিও বিষয়বস্তু নির্বাচনে পত্রিকাটি বেশ উন্নতমানের পরিচয় বহন করে। অধুনা লুপ্ত পত্রিকাটির বিলুপ্তির খবর সম্পাদকীয়তেই রয়েছে। ----- "প্রথমদিকে যুগদর্পণ ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ পেল কিছুকাল। তারপর ষান্মাসিক রূপ নিল আর ইদানীং যুগদর্পণ-কে "অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত পত্রিকা" আখ্যা দেওয়া যায়। আসলে এটাই বোধহয় লিট্‌ল ম্যাগের ভাগ্য।"[১২২]

বিজ্ঞাপন প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই রয়েছে। বাংলা এবং ইংরাজি দুই ভাষার বিজ্ঞাপনই দেখা যায় তবে বিজ্ঞাপনের প্রাবল্য নেই।

<u>কবিতা</u>

রবীন্দ্রনাথের গ্রীষ্মের গান ------ শুদ্ধসত্ব বসু।

* * * * *

ভিখিরিটা ভিরমি খেয়ে
উত্তপ্ত পিচের পথে পড়ে যেতে
পাড়ার মস্তান চ্যাংড়া
চ্যাংদোলা করে তাকে বুকে তুলে
চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে
প্রশ্ন করে -- কি রে, এখন কেমন ?

হোক না গুমোট

ধান বন্ধ হলে তবু ভেসে আসে বাঁশির আওয়াজ।[১২৩]

ইশোল নাম আ! ---দিওয়ান সিং রংমুটির গারো কবিতার অনুবাদ। আনুবাদক প্রানেশ কর।

সুগন্ধে ভরা পুষ্পরাজি, সুমসৃণ ভূমি,

হরিৎ বৃক্ষসকল, ক্ষণজন্মা পতঙ্গরাশি

সবাই যেনো প্রকাশ করে চলেছে

'হে ঈশ্বর, তুমি মহৎ' !

মৃদুমন্দ বাতাসের কোমল স্পর্শে

আকাশে বিলীন সুউচ্চ পর্বতমালা

সাদা কালো লাল ধূসর মেঘের আনাগোনা

সবাই যে নো একসুরে গাইছে "হে ঈশ্বর, তুমি মহৎ"![১২৪]

মাঝরাতে-------- কমল সাহা।

মাঝরাতে শারীরীক সর্পিল দ্বন্দ

যন্ত্রণায় হৃদয় পুড়ে গাঢ় নীল ।

এই শূণ্য ঘরে নিঃসীম একাকিত্ব

ক্রমাগত বৃদ্ধি হয় তোমার ব্যবধানে

ফিরে এসো যথাশীঘ্র সৃষ্টির উল্লাসে

প্রবাসী শরীরের বুকের উষ্ণতা

দিয়ে শুদ্ধ কর কবির করতল;

শব্দের ঘেরাটোপে জন্ম নেয় কবিতা

নিস্তব্ধ রাত্রি দীর্ঘ হতে হতে শেষ :

আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পায় কবির হৃদয়।[১২৫]

এছাড়াও রয়েছে ভাল কিছু কবিতা। কবিতা (আশীষ শর্মা), আমি তোমার বয়সী (নির্মল বসাক), আমার গল্প (অমর চক্রবর্তী), চিত্রকল্প (চৈতালী চট্টোপাধ্যায়), তুমি (আসীম কুমার নন্দী), ক্লান্ত অপরাহ্নে (নন্দলাল সেনগুপ্ত), উলুবেড়িয়ার যুবকের সিগন্যাল (সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায়) ইত্যাদি। প্রায় প্রতি সংখ্যাই রয়েছে কিছু অনুবাদ কবিতা। ঈশ্বর মহৎ (দিওয়ান সিং এস রং মুটির মূল গারো কবিতার অনুবাদ, অনুবাদক প্রাণেশ কর), কোচদের গান (অনুবাদক কমলেশ সরকার), সারা রাত বৃষ্টি হোক (কবি সমীর তাঁতীর মূল অসমিয়া কবিতার অনুবাদ, অনুবাদক কমল সাহা), ঝঞ্ঝাবাত্যা (নেপালী কবি পদম ছেত্রীর কবিতার অনুবাদ, অনুবাদক কমল সাহা) ইত্যাদি।

<u>গল্প</u>

ঘর--পার্থসারথি ঘোষ।[১২৬]- অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতা ও শেষে বুঝতে পেরে নীড়ে ফিরে আসা। লেখক ক্যামুর রচনা থেকে অণুপ্রাণিত - একথা স্বীকার করেছেন। তবে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে আপনি সম্বোধন করছে --- কোথায় যেন গল্পটিতে ছন্দপতন মনে হয়। সামগ্রিক রস নিকর্ষে বাধা পায়।

দূরত্ব-- যূথিকা দাশগুপ্ত [১২৭]। -- সমাজসেবী বড়লোকের স্ত্রী শান্তি বন্যায় বিধ্বস্ত ভিখারীকে বাসী রুটি খেতে দেয়। শুকনো রুটি গলায় আটকে মারা যায় উপবাসী বৃদ্ধ। কিন্তু পতি-পুত্র প্রাচুর্য্যের গর্বে গরবিনী শান্তির এতে মোটেই শান্তি ভংগ হয় না । মৌলিক চিন্তা আছে বটে গল্পটিতে তবে পরিবেশনা কেমন যেন এলোমেলো।

ঈশ্বর-- বিদ্যুৎ দাস [১২৮]। -- ১৯৭০-৭১ –এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা গল্প।

এছাড়া রয়েছে দুজনে নির্জনে (তপন দাস), নীল মিছিলের সবুজ চোখ (ভারত ঘোষ), ছবি (লক্ষ্মী দাস), পশু (পার্থসারথি ঘোষ), দ্বিতীয় জোছন (তুষার কান্তি সাহা) ইত্যাদি।

প্রবন্ধঃ

যুগদর্পনে প্রবন্ধের প্রাবল্য নেই। অন্তত গবেষক যে কটি সংখ্যা পর্যালোচনা করবার সুযোগ পেয়েছেন সে সব সংখ্যায় প্রবন্ধ নেই বললেই চলে। দুই একটি মাত্র প্রবন্ধ দেখা যায়।

পত্রিকাটিতে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক কিছু রচনা রয়েছে। যেমন কোচদের গান (কমলেশ সরকার), গারো পাহাড়ের রাজবংশীদের গান (কমলেশ সরকার), হাজং জনজাতির বিবাহ প্রথা (তুষার কান্তি সাহা) ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংগে সাক্ষাৎকার ও চোখে পড়ে।

অঙ্কুর (১৯৮৭ -)

সম্পাদক হেলালুজ জামান। ফুলবাড়ি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হোত। পত্রিকাটি নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে কোন বিশেষ সংখ্যা এখনও প্রকাশ হয়ে থাকে। প্রতিটি সংখ্যাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। শুধু একটি সংখ্যা পাওয়া যাওয়ার দরুন পত্রিকাটি সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য সম্ভব নয়।

নবপরিচয় (১৯৮৯ -)

সম্পাদিকা বেগম হাসিনা। পত্রিকাটি বেশ উচুমান সম্পন্ন ছিল। দ্বি-মাসিক পত্রিকাটি কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরই বন্ধ হয়ে যায়। তুরা শহরের উত্তর পশ্চিমে গারো–পাহাড়ের ফুলবাড়ি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য এভাবে

বর্ণিত হয়েছে ----- "একটি উদ্দেশ্য নিয়েই পত্রিকার জন্ম। নব পরিচয় যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তা হল বাংলা সাহিত্যের প্রণম্য লেখকদের পাশাপাশি স্বল্প পরিচিত নবীন লেখকদের সৎ সাহিত্য সৃষ্টিকে তুলে ধরা বৃহত্তর পাঠকের দরবারে"।[১২৯] 'নবপরিচয়ে' সাময়িক পত্রিকার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি চিকিৎসা বিষয়ক রচনা ইত্যাদির সমন্বয় পত্রিকাটির গুণগত উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে। তদুপরি সামাজিক সচেতনা মূলক প্রবন্ধ যেমন --- কন্যা নির্যাতন, মুসলিম সাহিত্যিকদের পিছিয়ে পড়ার ইতিহাস ইত্যাদি পত্রিকাটিকে যে কোন মূলধারায় সাময়িক পত্রিকার সমস্যমান স্থান দিয়েছে। ছাপাখানার দুর্লভতা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্যার দরুণ কালের গর্ভে বিলীন না হলে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'নবপরিচয়' যে একটি বিশেষ স্থান দখল করতে পারত, এ কথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

বহু বিখ্যাত কবি লেখকদের রচনা এ পত্রিকায় রয়েছে।

পত্রিকাটিতে কোন সূচীপত্র নেই। নেই কোন বিজ্ঞাপনও। চিঠিপত্র বিভাগটি বেশ বলিষ্ঠ। পত্রিকাটি যে বেশ উঁচুমানের ছিল তা চিঠিপত্র পড়লেই বুঝতে পারা যায়। এ সম্পর্কে বিশ্বজিৎ নন্দীর প্রবন্ধ "গারোপাহাড়ের বাংলা পত্র-পত্রিকাঃ একটি সমীক্ষা"–তে বলা হয়েছে --- "নব পরিচয় গারো পাহাড়ের সাহিত্যচর্চাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।"[১৩০]

<u>কবিতা</u>

হলুদ পাখির খোঁজে ------পুর্ণেন্দু পত্রী।

দুদিকেই দৃশ্য এক
খাদের পাথর

দুহাজার বছরের মহীরুহ এখানে কঙ্কাঁল

শর শয্যা নিজের শিকড়ে

দ্রুতগামী অটো রিক্সা

এইখানে নামিয়ে দিয়েছে

আমার উপর দিয়ে

দৌড়ে যাচ্ছে বাদসা শহর।

ঘাতক দৃশ্যের মধ্যে কোথায় রয়েছে খুঁজতে হবে

হলুদ পাখিটা।[১৩১]

অন্ধ বাউলের গান--- শক্তিপদ ব্রহ্মচারী।

* * * *

আকাশে খুঁজেছি পথের নিশানা বাতাসে খুঁজেছি প্রাণ

ভোরের শিশির ছিটিয়ে দিয়েছে দুমুঠো হলুদ ধান

দশ দিশ ভরে কোলে টেনে নেয় অজনা অন্ধকার ,

অন্ধ বাউল গান গেয়ে ফেরে কোন সে বনের ধার !![১৩২]

<u>গল্প</u>

অতিক্রম- রুবি দত্ত।[১৩৩]--জীবন সায়াহ্না বসে স্মৃতিচারণও একাকীত্ব মানুষকে অভিমানী করে তোলে - তারই কাহিনি।

মুক্তপাখী-এ। মান্নাফ।[১৩৪]----মুসলমান মেয়েদের জীবন কথা। সামাজিক নিয়মের নিগড়ে বন্দী ১৭ বৎসরের সাজিদা বিয়ে করতে বাধ্য হয় ৭২ বৎসর বয়সী হাজী সাহেবকে।

এছাড়াও দু- একটি ভালো গল্প পত্রিকাটিতে রয়েছে। দয়া (আশিস রঞ্জন নাথ), অনুগমণ (আবদূর রাকেব) ইত্যাদি।

<u>প্রবন্ধ</u>

নজরুল প্রেমচেতনায় পরিবেশ পরিমন্ডল - আবদুল আজীজ আল আমান।

মানিবিকতার কবি নজরুলের প্রেমচেতনা হয়ত ছিল অস্থির চঞ্চল, তবে আবেগ তাড়িত মোটেই নয়। -----"তার প্রেমমানসিকতার এই লোকায়তভাব, এই অস্থির চঞ্চলতা , এই আবেগ দৌর্বল্য, আবার গাম্ভীর্যে অটল কখনও বা মানবিক এই সব দোষ দুর্বলতা। এই সব মহৎ গুণাবলী কবি নজরিলের ব্যক্তিগত প্রেমেও সমানভাবে সঞ্চারিত। নজরুল জীবনীর পাঠক মাত্রই আমরা অপরিসীম কৌতুহল ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, প্রেমের ক্ষেত্রে নজরুল মাঝে মাঝেকেবল দুর্বল নন, চপল, চঞ্চল এবং অবেগতাড়িত। কোন কোন সময় তিনি অন্য পক্ষের মানসিক অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করার অবকাশ পর্যন্ত পাননি, সামহিক অবেগের জোয়ারে আপনি ভাসমান, নিমজ্জমানও। পরিশেষে বিরহ বিষে নীলকণ্ঠ এই-ই নজরুল - নিজস্বতাকীর্ণ, কিন্তু একান্ত ভাবেই মানবিক।'' [১৩৫]

কন্যা নির্যাতন একটি সামাজিক ব্যাধি ------ ধ্রুব রায়।-------স্পর্শকাতর বিষয়ের উপর আলোকপাত। -----"যতদিন সমাজে নারী সম্পর্কে যে মূল্যবোধ আছে তার আমূল পরিবর্তন হয়। আর এই পরিবর্তনে নিশ্চয় নারীদেরও অনেক দায়িত্ব থেকে যায়। স্বাধীনতা যেমন চাইলেই পাওয়া যায় না, অর্জন করতে হয়।'' [১৩৬]

মুসলিম সাহিত্যিকদের পিছিয়ে পড়ার ইতিহাস - ডঃ শফিকুজ্জামান। মৌলিক ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ।

"বাংলা ভাষাই যে বাঙালী মুসলমানদের ও মাতৃভাষা এই সত্য প্রথম উপলব্ধি করলেন নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮ – ১৮৯৩)। তিনি বাঙালী মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ অণুসন্ধান করতে গিয়ে বুঝলেন ভুল শিক্ষা গ্রহণই এর মূল কারণ। তিনি বাঙালী মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানালেন এবং তাদের মাতৃভাষাও যে বাংলা তা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় মুসলমানরা বাংলাভাষার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাই তাঁকে মুসলিমদের রামমোহন বলা হয়।"[১৩৭]

<u>নক্‌রেক (১৯৯০-৯৬)</u>

সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাগ। পত্রিকাটি ৬ বৎসর চলেছিল। ষান্মাসিক পত্রিকা। ৮-৯টি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। গারো পাহাড়ের পাঠক সমাজে যথেষ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল। সম্পাদকের চাকুরীস্থল পরিবর্ত্তন হওয়ার দরুন পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

পত্রিকাটির মাত্র একটি সংখ্যাই যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে। একটি সংখ্যা পড়ে একটি সাময়িক পত্রিকার সামগ্রিক বিচার করা সম্ভব নয়। তবে পঠিত সংখ্যার বিচারে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে পত্রিকাটি সম্ভাবনাময় ছিল বটে। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-রম্যরচনা, জীবনীমূলক, বাচ্চাদের পাতা, চিঠিপত্র ইত্যাদিসব বিভাগই পত্রিকাটিতে রয়েছে। তবে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার মতো 'নক্‌রেক'-এর অবস্থা অতি করুণ। মাত্র একটি প্রবন্ধ রয়েছে। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ ও বাইন্ডিং বেশ ভাল।

চিঠিপত্র বিভাগের একটি চিঠির উল্লেখ করলে পত্রিকাটি সর্ম্পকে সম্যক একটি ধারণা পাওয়া যাবে। যদিও এই চিঠিটি পত্রিকাটির পূর্ববর্ত্তী সংখ্যার জন্য লিখিত তথাপি ___ "গত সংখ্যাটি সব দিক থেকেই প্রশংসার দাবীদার, কারণ প্রকাশিত প্রতিটি রচনাতেই আন্তরিকতার সুস্পষ্ট ছাপ বর্তমান। তবু তার মধ্যে মনে দাগ কাটে কাকলী চক্রবর্তী, ডলি রাভা, তেজেন্দ্রলাল

মজুমদার ও সৌম্য স্বপন চক্রবর্তীর কবিতা। সময়োপযোগী সম্পাদকীয় মন ছুঁয়ে যায় অনায়াসেই। গল্প আয়তনে বড় হলেও চমৎকার। ভাল রম্য রচনা কল্যাণ দেশমুখ্যেরও। ছোটদের পাতা সংক্ষিপ্ত হলেও আকর্ষনীয়। অল্প কিছু মুদ্রণ প্রমাদ বাদ দিলে কাগজের মান, ছাপা ও সম্পাদনায় সম্পাদকের মুন্সীয়ানা স্বীকার করতেই হয়"। [১৩৮]

কবিতাঃ

অনুভব----- ডলি রাভা।

আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়ে
একটি কবিতা কাঁদে ------
অহরহ, তাজমহলে শাহজাহানের
অনুরাগের মতই।[১৩৯]

রয়েছে আরও কিছু কবিতা। দুটি লিমেরিক (শুদ্ধসত্ত্ব বসু), অভিমান চোখে মুখে মাখিনি কখনো (তপন পাত্র), অবশ আড়াল (বিশ্বজিৎ নন্দী)। কিছু অনুবাদও চোখে পড়ে। ফ্রিং ফ্রাং (মূল গারো কবিতার অনুবাদ), সদা (হিন্দি কবিতার অনুবাদ) ইত্যাদি।

গল্প

বখ্‌শিষ[১৪০] ------ ভগবতী চরণ বর্মার হিন্দি গল্পের অনুবাদ, অনুবাদক তেজেন্দ্র লাল মজুমদার। এখানে গল্পের চরিত্র কমলাকান্ত অতি চমকপ্রদ ভংগীতে মোগলদের পূর্ব পুরুষের প্রতি ষ্রদ্ধা হেতু কীভাবে ইংরেজকে নিজেদের রাজত্ব বকশিশ হিসাবে দিয়ে দিলেন তার এক সরস চিত্র এঁকেছেন।

বাঁজা ----- কাজী সইদুর রহমান রাজা।[১৪১]

<u>প্রবন্ধ</u>

বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ ------ সৌমিত্র মজুমদার।

পাঠ্যপুস্তকের রচনা এ নয়। মৌলিক বচার নিয়ে প্রবন্ধটি রচিত। বিজ্ঞাপনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন প্রাবন্ধিক। যদিও বিষয়টি প্রবন্ধ কিন্তু বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত প্রাবন্ধিকের একটি ছড়া উল্লেখ না করলেই নয়। ------

"বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে মাথায় দিলাম তেল
চুল গজানো দুরের কথা হল সে কতবেল !
দাঁতের গোড়া শক্ত হবে বিজ্ঞাপনে দেখে
দোকান থেকে ঐ মাজনই এনে দিলাম রেখে ।
রোজই ঘষি সকাল-রাতে কোথায় পাটি শক্ত ?
নতুন রোগ এক দেখতে পেলাম পড়ছে দাঁতের রক্ত।

****

এমনি করেই বিজ্ঞাপনের নিত্য ফাঁদে পড়ি
প্রতারণার জাল বুঝেও তাও সেই পথই যে ধরি।।

অন্যান্য বিভাগও পত্রিকাটিতে রয়েছে রম্যরচনা (সন্তানসমস্যা), জীবনীমূলক (অদ্বিতীয়া আশাপূর্ণা), বাচ্চাদের পাতা , চিঠিপত্র ইত্যাদি।

<u>মিলন (১৯৮৪ থেকে এতাবদ্)</u>

সম্পাদক শ্রী বিশ্বজিৎ নন্দী। উমিয়ামের সমসাময়িক এই পত্রিকাটি আজও সাফল্যের সঙ্গে নিজ ধ্বজা বয়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বজিৎ নন্দীর অকুণ্ঠ প্রয়াস ও নিষ্ঠা পত্রিকাটিকে

উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, শুধু তুরার বাঙালিই নন - বাংলাদেশের বিশেষ ও নামী কবি লেখকদের রচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ।

দীর্ঘায়ু হওয়া লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বৈশিষ্ট্য নয় বলে যারা মনে করেন, 'মিলন' তাদেরকে ভুল প্রতিপন্ন করে আজ ৩১ বছর ধরে স্বমহিমায় বিরাজিত পত্রিকাটির প্রথমপাদের সংখ্যায় নবজাতকের ত্রুটি থাকলেও ধীরে ধীরে পত্রিকাটি আপন অধ্যবসায় বলে আজ সাময়িক পত্রিকা মন্ডলে নিজের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে । শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই নয় সমস্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে পত্রিকাটি পৌঁছে যায়। একটি সাময়িক পত্রিকাকে দীর্ঘায়ু করার পেছনে সম্পাদকের এ হেন যোগাযোগের প্রয়াস যে কতটা প্রয়োজনীয়, তা পত্রিকাটির চিঠিপত্র বিভাগ পড়লেই বোঝা যায়। ভারতের প্রায় সকল শহরেই এবং ভারতের বাইরেও অর্থাৎ যেখানে বাংলা চর্চা রয়েছে, পত্রিকাটি পাঠানো হয় ও জনগণ চিঠি, রচনার মাধ্যমে পত্রিকাটি সম্পর্কে সম্পাদককে উৎসাহিত ও প্রেরণা দান করে থাকেন।

বিষয় নির্বাচনে অভিব্যক্তি ও উপস্থাপনায় পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে ভাল। প্রথমদিকের কিছু সংখ্যায় বিষয় বিভাগও সূচীপত্র না থাকলেও কালে কালে পত্রিকাটি যত পরিপক্ক হয়েছে সেই সমস্তই যথাস্থান গ্রহণ করেছে। পত্রিকাটি গল্প-কবিতা-প্রবন্ধে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। যথেষ্ঠ অনুবাদের কাজ দেখা যায়। এ ছাড়াও গারো অঞ্চলের জীবনচর্চা , সাহিত্যচর্চা , লোককথা ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত বিস্তর তথ্য পত্রিকাটির প্রায় প্রতি সংখ্যাই দেখা যায়। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নিরীখে বিচার করলে পত্রিকাটি এখানেই সফল ও সার্থক।

তবে মুদ্রণ দোষ ও বানান ভুল প্রথম থেকে এতাবধি রয়েছে। যা পাঠকের চোখকে রীতিমত পীড়িত করে ।

কবিতাঃ

***আগন্তুক*----** সুব্রত চৌধুরী।

আঁধারের বুক হতে

কে তুমি আগন্তুক

এসেছ সহানুভুতির আলো নিয়ে ?

বহু শতাব্দীর

লাঞ্ছিত মানবের

সাথী হবে তুমি আজ ।

* * * * *[১৪২]

***এ তবে কেমন বোধন*-----** সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী।

* * *

ফি বছর বন্যা এসেছে ভেঙ্গে গেছে ঘর

খরায় খেয়েছে সব, সবকিছু মাঠের ফসল

প্লাবন শোনে নি কথা করে গেছে রণ

ছিন্ন ভিন্ন করেছে জীবন, এ তবে কেমন বোধন ?[১৪৩]

***কোথায় রাখব হাত*----**পান্নালাল মল্লিক।

কোথায় রাখব হাত ---

চোখের সামনে ফুটিফাটা বুকের জমিন

পায়ের তলায় মানুষের কফিন।

পাহাড়তলির ঘরে ঘরে শুয়ে আছে কালের রাখাল

কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে মগ্ন, ঢেকেছে শরীর,

পাহাড়ের কোন দিকে কোথায় রাখব হাত ---

প্রীতির বেড়া টপকে সীমান্তে বুলেট ঝাঁঝরা

বুকের উপর রক্তের যে আলপনা ---

সেই আমার ভারতবর্ষ, আমার মা।''[১৪৪]

ঐক্যহীনতা ---------- গারো কবিতা। মূল কবি – নবীন আর মারাক। অনুবাদক - হারাধন নক্‌রেক।

ঐক্য যে কি বুঝত না তো পিতৃপুরুষেরা

রক্তারক্তি মারামারি কেবল , কে হবে কার সেরা,

বাহু বলে করত শাসন আপন এলাকা

শত্রু নিধন করত তারা খড়্গ, ঢাল দ্বারা।

* * * *

হায় রে কবে এই জাতি হবে সবে এক প্রাণ

শিরে লয়ে দায়িত্বভার সবেতেই হবে আগুয়ান।

না হয় তব নিরব দর্শক কর সবে মিলে জাতির গঠন

বিনা দেশপ্রেম জাতির উন্নতি হয় কবে কদাচন।[১৪৫]

আরও যে সব কবিতা রয়েছে - মা আসছেন (ভারতী সেন), দেহের ভিতর জেগে আছে (বুদ্ধদেব চক্রবর্তী), অন্তর্গত হৃদয়ের খেলা (সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী), ফিরে যাবো (শান্তি রায়), স্বাধীনতার প্রহরে (মজুর রহমান বাবু), একটি নাম লেনিন (সৌম্য স্বপ্ন চক্রবর্তী), পসারিণী (সৌমিত্র মজুমদার), সব কথাই মনে আছে (বিশ্বজিৎ নন্দী), পর্যটকের মতো (কালিপদ প্রধান), প্রেরণা (বিধান সাহা), ধ্রুপদী বিষাদ (সুব্রত সরকার) , যুদ্ধ (সত্যজিৎ চৌধুরী) ইত্যাদি।

গল্প

একটি মেয়ের কাহিনি – ভাস্কর।[১৪৬]--আপত্য স্নেহ জাত ধর্মের বিভেদের বাইরে। নিজের ছেলে আলমকে হারিয়ে নাফিসা ও সিরাজ বাংলাদেশের রিফিউজি ক্যাম্প থেকে আনা অমৃককেই বুকে টেনে নেয়। তবে কাহিনির সঙ্গে নামকরণের কোন সাযুজ্য দেখা যায় না।

দুই রাত্রি - হিন্দি সাহিত্যিক ভগবতী চরণ শর্মার অনুপম গল্প, অনুবাদক পূর্ণেন্দু ঘোষ[১৪৭]।-- রাতের চলন্ত ট্রেনে দুই যাত্রীর মধ্যেযে প্রেম শুরু হয়েছিল, দ্বিতীয় দর্শনে যা কি না হয়েছিল এক পতিতালয়ে - সেই প্রেমের মুখাগ্নি হয়।

শেষ প্রশ্ন---------- প্রতাপাদিত্য দেব।[১৪৮] পুরুষের কামের স্বীকার এক নারী শেষ অবধি বেছে নেয় মৃত্যুকে। বহু পরিচিত প্লটের পুনঃবর্ণন।

এছাড়াও যে সমস্ত গল্প রয়েছে এক টুকরো খবর (পার্থ দাস), উপহার (আলি আহাসান), ফিরে এলো না (অনিল কুমার রায়), মানুষের জন্য (পপি বিশ্বাস), শুলি ঝরা স্বপ্ন (অনিল কুমার রায়), ভাবনা (সন্ধ্যা রায়), সম্বল (রূপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়), ঘুণের গন্ধ (সম্রাট মৈত্র), গানের টানে – অনুগল্প (বরুণ মন্ডল), গারোদের উপকথা (প্রাণেশ কর) ইত্যাদি।

প্রবন্ধ

গণতন্ত্র ও শ্রমিক সমাজ- রবীন্দ্র নাথ ঘোষ।

কি ভাবে গণতন্ত্র শ্রমিক সমাজের জন্য কার্যকারী হতে পারে তারই প্রতিবেদন এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। সাম্রাজ্যবাদীদের জাঁতাকলে পিষ্ট শ্রমিক সমাজকে আজ জাগরুক হতে হবে। "সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই সৃষ্টি হল যান্ত্রিক সভ্যতা। এল শিল্পবিপ্লব, এল যন্ত্রের যুগ। আর তারই সংগে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো এল নবরূপে শ্রমিক সমাজ। সত্যবোধ ও জ্ঞানের পরশ লাগলো তাদের কানে। তারা ভাবতে শিখলো তাদের এই দুর্দশার কারণ কোথায়,জানতে

চাইল তাদের হাতে গড়া সম্পদ কেন মুষ্ঠিমেয় মানুষের সেবায় নিয়োজিত। সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য মুমূর্ষু গণতন্ত্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু হল তাদের লড়াই। এল তাই শ্রমিক বিপ্লব।''[১৪৯]

বঙ্গে-বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষার নিরুদ্দেশ যাত্রা - জীবনময় দত্ত।

বাংলা ভাষা আজ অবক্ষয়ের পথে। প্রাবন্ধিক তথ্য সহযোগে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন । "বাংলা ভাষার বিপন্নতা একটি জলন্ত বিষয়। বাংলা ভাষার দুর্বলতা, বাস্তব অসুবিধা , বানান সমস্যা, পরিভাষার জটিলতা, ঔপনিবেশিকহীনমন্যতা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মারপ্যাঁচ, চাপ এবম্বিধ এত সমস্যা আছে যে তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হওয়া দরকার। আর তা এখনই। এই প্রতিবেদনে সামান্য কিছুকেই তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। দরকার নিজেদের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগানো, বাংলা ভাষাকে দ্বিধাহীন ভাবে ভালবাসা আর একসঙ্গে রুখে দাড়িয়ে বলা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাকে যথা সম্মান দিতে হবে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার অনিবার্য করতে হবে"।[১৫০]

হাজং দের ভাষা - বীরেন হাজং।

অত্যন্ত তথ্যবহুল রচনা। "হাজং ভাষা এখনও জীবন্ত কথ্য ভাষা। হাজংদের গ্রামে গ্রামে, তা সেটা বাংলাদেশ, আসাম বা মেঘালয় যেখানেই হোক --হাজং-রা তাদের ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করে, দুঃখ, হাসি কান্নার কথা বলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাটিকে ভাষা নামে অভিহিত না করে উপ-ভাষা নামাঙ্কিত করাই সমীচিন। হাজং যদিও মাত্র ১,৫০,০০০ মানুষের ভাষা তথাপি এই ভাষার পার্থক্য আছে অঞ্চল ভেদে । অঞ্চল হিসাবে হাজং ভাষাটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – সুসুংঙী, দশকানীয়া, বড়ইবাড়িয়া এবং মেচপাড়িয়া। পূর্ব- পশ্চিম খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ অংশ, উত্তর ময়মনসিংহের নিড়াই নদী পর্যন্ত সুসুংঙী ভাষা

প্রচলিত। এই অঞ্চলে শ,স, ষ –র পরিবর্ত্তে অসমিয়ার 'হ' উচ্চারণ বিশেষভাবে প্রচলিত। নিতাই নদীর পশ্চিম তীর থেকে আমপাতি অঞ্চল পর্যন্ত দশকানীয়া হাজং ভাষার অঞ্চল । আমপাতি থেকে ভাইটবাড়ি ও গোয়াল গাঁও পর্যন্ত কড়াইবাড়িয়া হাজং ভাষার অঞ্চল এবং টিক্রিকিল্লা অঞ্চলে মেচপাড়িয়া হাজং ভাষা প্রচলিত"। [১৫১]

কবি ও কবিতা- তিমির বরণ মন্ডল।

কবিতার মাধ্যমে নিজেকে চিনে নেবার কথা এই প্রবন্ধে রয়েছে। তথ্য সমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ। "প্রাত্যহিক জীবনে এমনই বহু আবেগপ্রবণ ঘটনা ঘটে, শর অভিঘাতে আমরা খুঁজে বেড়াই আশ্রয়, বুঝে নিতে চাই ঘটনাকে, বুঝে নিতে চাই নিজেকে, আমার 'আমি'-কে। এ 'আমি', আমার বাইরের 'আমি'–কে পরিবর্তিত করছে। অন্যদিকে বাইরের আমি ভিতরের আমিকে সংবেদনশীল করছে। যেন একে অন্যের কাছাকাছি আসতে চায় এক সৌসাম্যের ভিত্তিতে। এমনি করে আমরা কবিতার কাছে এলেই বুঝে নিতে চাই নিজেকে, আমার আমিকে ও সংবেদনশীল মনকে। কবিতা তখনই কবির তথা পাঠকের বোধে বেদনাঘন আমি'কে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। পাঠক তখন বুঝতে চেষ্টা করে কবিকে ও কবিতাকে। পাঠক বেরিয়ে আসার সুযোগ পায় প্রাত্যহিকতা থেকে, অভ্যস্ত জীবনের চলন থেকে। ভেঙ্গে যায় তার অচলায়তনের কঠিন প্রাচীর। জরুরী হয়ে যায় তখন কবিতার। আমরা আমাদের অব্যক্ত অনেক সুক্ষ্ম অনুভব-অনুভূতিগুলো এ কবিতার মধ্য দিয়ে বলতে পারি; আবার সুক্ষ্ম অনুভূতি-অনুভব গুলোর সত্যতা বুঝতে পারি কবিতার মধ্য দিয়ে"। [১৫২]

এছাড়াও আরও কিছু প্রবন্ধ রয়েছে। যেমন - বর্তমান সমস্যা এবং আমাদের পূজা (মল্লিক বিজয় রঞ্জন সোম), হাজং জনজাতির সমাজ কাঠমো (হাজং অর্ণব), ডালু জাতির ভূত-ভবিষৎ (জগদীশ বর্মণ), জয় মা (অজন্তা কর দেব), ফিরে দেখা তুরা শহরের যাত্রাচর্চ্চা (বিশ্বজিৎ

নন্দী) ইত্যাদি। মিলন পত্রিকায় প্রবন্ধের বাহুল্য নেই। কোন কোন সংখ্যায় তো একটিও প্রবন্ধ চোখে পড়ে না ।

মিলনে বেশ ভ্রমণ বিষয়ক রচনা রয়েছে। ঘুরে এলাম পুরী ধাম (সৌমিত্র মজুমদার), নাটিয়াং ও দুর্গাপূজা (বিজয় সিংহ চৌধুরী), গারো পাহাড়ের কামাখ্যা ধামের উপাখ্যান (দীনবন্ধু ভট্টাচার্য), কালাতোপের জঙ্গলে কিছুক্ষণ (শর্মিলা চট্টোপাধ্যায়)।

মিলনে তুরার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন খবর রয়েছে। যেমন – সমরেশ বসুর প্রয়াণে স্মরণসভা। তুরা শহরে কবি সম্মেলন, সংগীত শিল্পী অজিত সাংমার সাক্ষাৎকার, সম্পাদকের 'মাইকেল মধুসূদন' পুরষ্কার প্রাপ্তি , তুরায় অনুকূল ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্র সন্ধ্যা উদযাপন ইত্যাদি।

প্রতিটি সংখ্যায়ই অনেক বিজ্ঞাপন রয়েছে । এমনকী শেষদিকের পত্রিকাগুলোয় অনুদানের আবেদনও দেখা যায়।

গ্রন্থালোচনা ও পত্রিকার প্রাপ্তি স্বীকার ও নিয়মিত ভাবে দেখা যায়।

চিঠিপত্র বিভাগটি প্রশংসার দাবী রাখে। সম্পাদকের সাহিত্যপ্রীতি অনন্য। কারণ সকলেই নিজের পত্রিকা সম্পর্কিত ভাল কথাই ছাপতে পছন্দ করেন । কিন্তু এই পত্রিকায় যে সমস্তচিঠিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশদভাবে বলা হয়েছে - সেটাও সম্পাদক নির্ভিকতার সঙ্গে ছেপেছেন।

১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল অবধি গারো পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিছু ক্ষীণজীবি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর প্রথাগত অসুবিধা ও অন্যান্য কারণে প্রতিটি পত্রিকাই কয়েক সংখ্যার পর বন্ধ হয়ে যায়। চাকুরী সূত্রে বিশ্বজিৎ নন্দী মহেন্দ্রগঞ্জে থাকার সময় কিছু শিক্ষিত যুবককে একত্রিত করে বিষ্ণু পালের সম্পাদনায় প্রকাশ করেছিলেন 'সোমেশ্বরী' পত্রিকা। দুই

একটি সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে ডালু থেকে জগদীশ বর্মণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বিবেকবার্তা'। পত্রিকাটির আয়ু ছিল মাত্র একটি সংখ্যা। সম্পাদক জগদীশ সরকার 'মনসিজ' পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। বেশ কয়েকটি সংখ্যা বেরিয়ে ছিল বলে জানা যায়। তুরা শহরের বেলদার পাড়া অঞ্চল থেকে 'প্রজ্ঞাঞ্জলি' আত্মপ্রকাশকরে৷ সম্পাদক ছিলেন প্রদ্যুৎ ভৌমিক। শক্তি সংঘের প্রকাশিত 'শক্তি অর্ঘ' প্রকাশিত হয়েছিল ২০০১ সালে। সম্পাদক ছিলেন জগদীশ সরকার। দুটি সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

<u>সূত্র-নির্দেশ</u>

[১]দেশান্তর- ২, পৃঃ সম্পাদকীয়

[২]স্বাধীন দেওয়াল – বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত৷ দেশান্তর- ২, পৃঃ ৩

[৩]রাজেশ্বরী – উদয়ন ঘোষ৷ দেশান্তর- ২, পৃঃ ১২

[৪]কেউ কেউ কবিতার পাঠক – বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য৷ দেশান্তর- ২, পৃঃ ৫

[৫]পার্বতী১মবর্ষ৪র্থসংখ্যা - সম্পাদকীয়

[৬]মাঝখানে - নীলিমা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা পার্বতী১মবর্ষ৪র্থসংখ্যা - পৃঃ ৪

[৭]পরগাছা - মায়া বসু (কলকাতা)। পার্বতী১মবর্ষ৪র্থসংখ্যা - পৃঃ ৮

[৮]বাদী - পার্লবাক, অনুবাদ সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়৷ পার্বতী১মবর্ষ৪র্থসংখ্যা - পৃঃ ২১

[৯]ছন্দরাজ - শ্রীমতী শঙ্করী সেনগুপ্ত৷ পার্বতী১মবর্ষ৪র্থসংখ্যা - পৃঃ ৩৫

[১০]অসাধ্য সাধন - ইন্দ্রানী গুহ৷ পার্বতী১মবর্ষ৪র্থসংখ্যা - পৃঃ ১৮

[১১]নাদির শাহের পুনরাবর্তন – অমলা মৈত্র৷ পার্বতী১মবর্ষ৪র্থসংখ্যা - পৃঃ ৬

[১২]শতাব্দী – ১৭ অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্য পৃঃ ১৫

[১৩]শতাব্দী – ৬ শরৎ-হেমন্ত সংখ্যা পৃঃ ৬

[১৪]শতাব্দী – ১৭ অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় পৃঃ ১

[১৫]পাহাড়ীয়া৩য়বর্ষ - প্রচ্ছদপট

[১৬]নিঃস্ব সূর্য চাঁদ - রমানাথ ভট্টাচার্য। পাহাড়ীয়া ২য় বর্ষ পৃঃ ৮

[১৭]মায়ামৃগ - জহরলাল বেরা। পাহাড়ীয়া ২য় বর্ষ পৃঃ ১০

[১৮]ভ্রূণের প্রার্থণা – বুদ্ধদেব মুখপাধ্যায়। পাহাড়ীয়া ১২শ বর্ষ সংখ্যা ২০পৃঃ নেই

[১৯]চেরাপুঞ্জীর প্রাচীন পাহাড় - কিনকাম সিং নংকিনিরী, অনুবাদ তাপস রায়। পাহাড়ীয়া ২৯শ বর্ষ ২সংখ্যা পৃঃ নেই

[২০]সাঁতার – ১ - ফাল্গুনী চক্রবর্তী। পাহাড়ীয়া ৩৫তি বর্ষ ২সংখ্যা পৃঃ ৩

[২১]কবর খুঁড়ে প্রাসাদ - করুণা কান্তি দাস। পাহাড়ীয়া ১ম সংকলন বর্ষ পৃঃ ২

[২২]নীল ছোবল – দীপ্তি। পাহাড়ীয়া ১ম সংকলন বর্ষ পৃঃ ৪

[২৩]একটি গোলাপের চারা - সুভাষ দে। পাহাড়ীয়া ১ম সংকলন বর্ষ পৃঃ ৩

[২৪]ছেলের অসুখ - মিহিরকান্তি রায়। পাহাড়ীয়া ২য় বর্ষ পৃঃ ১৪

[২৫]ঘুম থেকে জেগে উঠে - মিথিলেশ ভট্টাচার্য। পাহাড়ীয়া ২য় বর্ষ পৃঃ ২

[২৬]সেই জিনিসের জন্য - শংকর চক্রবর্তী। পাহাড়ীয়া ২য় বর্ষ পৃঃ ৬

[২৭]'ঋতুরঙ্গ' ২ সম্পর্কে দু'চার কথা - ৩য় বর্ষ ১সংখ্যা পৃঃ শেষ পাতা

[২৮]'ঋতুরঙ্গ' ২ সম্পর্কে দু'চার কথা – ৪র্থ বর্ষ ১সংখ্যা পৃঃ শেষ পাতা

[২৯]সমুদ্র তো দৃশ্য নয় - যশোধীর চৌধুরী। ঋতুরংগ- ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ২

[৩০]তোমার প্রতিকৃতি - শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। ঋতুরংগ- ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ৩

[৩১]সূর্যাকাঙ্খা - জীবনময় দত্ত। ঋতুরংগ- ৩য় বর্ষ ১সংখ্যা পৃঃ৪

[৩২]ভোরের আলো ফুটলেই - শিশির ভট্টাচার্য। ঋতুরংগ-৩য় বর্ষ ১সংখ্যা পৃঃ৩

[৩৩]লোককবিতা - অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। ঋতুরংগ-৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ৩

[৩৪]আধুনিক কাব্যে নতুন দৃষ্টিভংগী - প্রশান্ত জ্যোতি দাস। ঋতুরংগ- ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ১৭

[৩৫]ধান সিড়ি বেয়ে বেয়ে - রমানাথ ভট্টাচার্য। ঋতুরংগ- ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ১৬

[৩৬]আধুনিক বাংলা কবিতার লেখক ও পাঠক - করুণাকান্তি দাস। ঋতুরংগ- ৩য় বর্ষ ১সংখ্যা পৃঃ২২-২৩

[৩৭]রুদ্রবীণা ২য় সংখ্যা, পৃ৩৪।

[৩৮]নতুন পৃথিবী - সাধন বসাক। রুঃ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৮।

[৩৯]এই রে ভজা - বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য,বারাণসী,১০বৎসর।রুঃ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৫৯।

[৪০]হাওয়ায় আমার চলাচল - রমানাথ ভট্টাচার্য।রুঃ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২১।

[৪১]ফাটল - মিহির কান্তি রায়।রুঃ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৫।

[৪২]দুসরা বেহুলা - শ্রী মাধব।রুঃ ১ম বৎসর ৩য় সংখ্যা পৃঃ ২৫

[৪৩]কোন ধনে হয়ে ধনী - ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য।রুঃ ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৃঃ ৫৫।

[৪৪]বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু – ব্রহ্মপুত্র।রুঃ ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃঃ ১২।

[৪৫]রাজা রামমোহন ও ভারতীয় রেণেসাঁস - সৌমেন সেন।রুঃ ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃঃ ১৬।

[৪৬]আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ও বর্ত্তমান নারী সমাজ - ছিন্নমূল (সম্ভবতঃ ছদ্মনাম)রুঃ ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃঃ ৪৫।

[৪৭]শ্রমিক সমস্যার বর্ণবোধ – নিরুপেক্ষ।রুঃ ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃঃ ৬-৭।

[৪৮]ডঃ হো চি মিন, অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।সং, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ২।

[৪৯]ইস্তাহার- মার্টরাড, অনুবাদক চিন্ময় দে।সং, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ১৭।

[৫০]নভেম্বর বিপ্লব -অনীতা গূণ।সং, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ৮-৯।

[৫১]তোমরা যারা - জয়ন্তী দেব।সং, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ৩৮।

[৫২]মাণিকের মা - অতশী অধিকারী। সং, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ১০

[৫৩]উপকথা - শ্রীমতি লিষ্টিনা লিনরার সৌজন্যে প্রাপ্ত খাসি লোককথা। সং, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ১৭

[৫৪]চোখ - অবনী কুমার বর্মণ। সং, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ২৮

[৫৫]ফুলশয্যার রাত - ভিয়েতনামের গল্প অনুবাদ উমা দাস। সং, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ৬

[৫৬]আর্তনাদ - কুলদা প্রসাদ ভট্টাচার্য। সং, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ৭

[৫৭]দয়াময় শইকীয়ার (যুগপট)। সং, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৯

[৫৮]কৃষণ চন্দরের (বোবা কাহিনি)। সং, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ১৮

[৫৯]সং, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ২২-২৩।

[৬০]সং, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ২৫-৩১।

[৬১]আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ও শরৎ সাহিত্যে নারীর মর্যাদা'- মীরা রায়।সং, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ৫-৭।

[৬২]সাহিত্য শিল্প ও জনজীবন - পীযূষ কান্তি চৌধুরী।সং, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ১২-১৩।

[৬৩]সাহিত্যিকের দায়িত্ব - প্রশান্ত চৌধুরী।সং, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ১৩।

[৬৪]নভেম্বর বিপ্লব - নমিতা গুণ।সং, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ২-৩।

[৬৫]সাহিত্যে সমসাময়িক বাস্তবতা - রঞ্জিত সেন।সং, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ৩৫।

[৬৬]অনিঃ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

[৬৭]বেপথু - উমা পোদ্দার।অনিঃ, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ১৫।

[৬৮]শান্তির পারাবত কে - মীরা রায়।অনিঃ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ২২।

[৬৯]এই প্রথম জানলাম - রমানাথ ভট্টাচার্য।অনিঃ ৫ন বর্ষ, ১ ও ২য় সংখ্যা পৃ ১৮।

[৭০]ফেরা - বিজয় কুমার ভট্টাচার্য।অনিঃ ৭ন বর্ষ, ১ ও ২য় সংখ্যা পৃ ২০।

[৭১]আমার ভাইয়ের রক্ত - কমলেশ পাল।অনিঃ ১০ন বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ২৭।

[৭২]অরুণার হাসি - মিহির কান্তি রায়।অনিঃ ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ৮-১২।

[৭৩]স্বপ্ন নয় - দিলীপকুমার বন্দোপাধ্যায়।অনিঃ ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ২৪-২৬।

[৭৪]মা - পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য।অনিঃ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ১১-১৪।

[৭৫]দৃষ্টিপাত - রাখী ভট্টাচার্য।অনিঃ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ২৪-২৫।

[৭৬]মাঝ উঠানে রোদ - মিহির কান্তি রায়।অনিঃ ৭ম বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা পৃ ২১।

[৭৭]জীবন নিয়ে খেলা - সনৎ বসু।অনিঃ ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ১৭-২২।

[৭৮]আলতা - পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য। অনিঃ ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ৫-১০।

[৭৯]বিবর্তন ও ভারতীয় সমাজ – বসুদেব ভট্টাচার্য। অনিঃ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ২৬।

[৮০]প্রসঙ্গঃ শিল্প - কান্তিময় দেব অনিঃ ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ২২।

[৮১]শ্রীহট্টের লোককবিতা - ডঃ দিলীপ লাহিড়ী ও ডঃ বিমলজ্যোতি দেবঅনিঃ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ৯।

[৮২]খাসি কবি উ শশ থাম - মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য।অনিঃ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ১৮।

[৮৩]খাসিয়া পাহাড়ে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা পর্ব - জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী।অনিঃ ৫ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা পৃ ১২-১৩।

[৮৪]গুয়াহাটী নগর বিষয়ক কিছু তথ্য এবং অনুমান - কল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য অনিঃ ৭ম বর্ষ, ১মও ২য় সংখ্যা পৃ ৮।

[৮৫]মেঘালয় রাজ্যের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি – সমুদ্র গুপ্ত।অনিঃ ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ৩৪।

[৮৬]সর্বধর্ম সমন্বয় - আশরফী বেগম।অনিঃ ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ১৬।

[৮৭]উমিঃ ৩য় সংখ্যা , সম্পাদকীয়।

[৮৮]জলের বদলে (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)।উমিঃ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২৬।

[৮৯]তোমাদের জন্য মালা --- কমল চক্রবর্তী।উমিঃ ৩য় সংখ্যা , পৃঃ ২৫।

[৯০]বিকেলের বর্ণফেরা --- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।উমিঃ ৬ঠ সংখ্যা , পৃঃ ১০।

[৯১]তোমার যা ইচ্ছে করো - সমীর তাঁতীর কবিতা।উমিঃ ৭ম সংখ্যা , পৃঃ ৪১।

[৯৩]সোর্স লাইট ও পরমেশ ---- মৃণাল বসুচৌধুরী।উমিঃ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭।

[৯৩]কলং তীরে হাতী ---- কল্যাণ ভট্টাচার্য।উমিঃ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬০।

[৯৪]ভোরের বাগান ---- কার্তিক লাহিড়ী উমিঃ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৪।

[৯৫]ফেরা ---তপন বন্দ্যোপাধ্যায় উমিঃ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৭।

[৯৬]বিপন্ন উনুন ও একটি ছুঁচো ---- কল্যাণ ভট্টাচার্য ।উমিঃ ৬ঠ সংখ্যা, পৃঃ ১৪।

[৯৭]বৌদ্ধ তীর্থ বিজয়নগর ------ গোপালকৃষ্ণ রায়।উমিঃ ৬ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২২।

[৯৮]আমি যাকে ভালবাসি ------ দেবব্রত দাস। উমিঃ ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৫।

[৯৯]খাসি জাতির উৎপত্তি - কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা -- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী ।উমিঃ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫।

[১০০]বাবু জীবন রায় ও খাসি সমাজে নবজাগরণ --জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য ।উমিঃ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৬ ।

[১০১]নাগা উপজাতির কাঠখোদাই ---------- উমা বাগচী ।উমিঃ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১১ ।

[১০২]আর কি দ্যাখো তুমি ---- বীরেন্দ্র নাথ রক্ষিত । উমিঃ ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ১৪ ।

[১০৩]কবিতা বিষয়ে দুটি ভাবনা --অশ্রুকুমার সিকদার ।উমিঃ ৬ঠ সংখ্যা পৃঃ ৫১ ।

[১০৪]কর্মঃ ৯ম সংখ্যা ।

[১০৫]ম্যাজিক ------ উদয়ণ ঘোষ ।৪র্থ বর্ষ কর্মঃ ৯ম সংখ্যা পৃঃ ৩২ ।

[১০৬]আয়নায় নিজের মুখ -----শৌভিক দত্ত ।৮ম বর্ষ কর্মঃ ১৬শ সংখ্যা পৃঃ সংখ্যা নেই।

[১০৭]কুহেলিকা --- সংযুক্তা দাশ পুরকায়স্থ ।১৬শ বর্ষ কর্মঃ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ৭ ।

[১০৮]গান্ধারীর অভিশাপ -------মীরা রায় । কর্মঃ ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ৭ ।

[১০৯]সমন্বয় -------- উমা পুরকায়স্থ ।কর্মঃ ৯ম সংখ্যা পৃঃ ১৩ ।

[১১০]অনুভব ----------অনিতা দে ।কর্মঃ ১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ১১ ।

[১১১]ইন্টারনেট------- সংযুক্তা দাশ পুরকায়স্থ।কর্মঃ ১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ৮।

[১১২]শান্তিনীড় ----- যশোধীর শ্যাম। কর্মঃ ১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ৬ ।

[১১৩]ভোর ----ধনঞ্জয় চক্রবর্তী। কর্মঃ ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ১৬।

[১১৪]প্রতিবাদ ----- সুবর্ণ মুখোপাধ্যায় । কর্মঃ ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ৮ ।

[১১৫]জীবনসন্ধ্যায় ------ মালবিকা বিশারদ । কর্মঃ ১৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ৩ ।

[১১৬]বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা ------ মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য কর্মঃ ৯ম সংখ্যা পৃঃ ১১ ।

[১১৭]প্রাগিতিহাসে পূর্বোত্তর ভারতের ভূমিকা ------ অভিজিৎ চৌধুরীকর্মঃ ১৬শ সংখ্যা পৃঃ নেই ।

[১১৮]যে সিনেমা এখনো দেখিনি -----প্রতিমা ভট্টাচার্য ।কর্মঃ ১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ৩ ।

[১১৯]হে নূতন, দেখা দিক আর বার ------ রজতকান্তি দাস ।কর্মঃ ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ৩ ।

[১২০]বিনা স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা ------- কল্পনা চৌধুরী।কর্মঃ ১৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ৭।

[১২১]গারো পাহাড়ের পত্র-পত্রিকাঃ একটি সমীক্ষা ---- বিশ্বজিৎ নন্দী, মিলনঃ উত্তর-পূর্ব লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্মেলন সংখ্যা ২০১২, পৃঃ ৫ ।

[১২২]যুগঃ ১০ম বর্ষ ১৮ সংখ্যা ।

[১২৩]যুগঃ ৭ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যা পৃঃ ১।

[১২৪]যুগঃ ৯ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যা পৃঃ ২৭।

[১২৫]যুগঃ ১৭শ সংখ্যা পৃঃ ২৫।

[১২৬]ঘর -পার্থসারথি ঘোষ। যুগঃ ৯ম বর্ষ১৭শ সংখ্যা পৃঃ ১।

[১২৭]দূরত্ব ----- যূথিকা দাশগুপ্ত। যুগঃ ৯ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যা পৃঃ৩।

[১২৮]ঈশ্বর --- বিদ্যুৎ দাস। যুগঃ ১০ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যা পৃঃ৩।

[১২৯]নবপরিঃ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা।

[১৩০]মিলনঃ উত্তর পূর্বাঞ্চল লিটল ম্যাগাজিন সম্মেলন সংখ্যা ২০১২।

[১৩১]নবপরিঃ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ১১।

[১৩২]নবপরিঃ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ১৪।

[১৩৩]অতিক্রম ---- রুবি দত্ত। নবপরিঃ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ১৩।

[১৩৪]মুক্ত পাখী -এ। মান্নাফ। নবপরিঃ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ১৭।

[১৩৫]নবপরিঃ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ৯।

[১৩৬]নবপরিঃ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ৬।

[১৩৭]নবপরিঃ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ১০।

[১৩৮]নকঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, চিঠিপত্র বিভাগ – সৌমিত্র মজুমদার (কলিকাতা), পৃঃ ৬০।

[১৩৯]নকঃ ৬ বর্ষ ৮ম সংখ্যা পৃঃ ৫।

[১৪০]বখ্‌শিষ ------ ভগবতী চরণ বর্মা। নকঃ ৬ বর্ষ ৮ম সংখ্যা পৃঃ ২০

[১৪১]বাঁজা ----- কাজী সইদুর রহমান রাজা। নকঃ ৬ বর্ষ ৮ম সংখ্যা পৃঃ ১৪

[১৪২]মিলনঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা পৃঃ ৩৩।

[১৪৩]মিলনঃ ১২শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা পৃঃ ২।

[১৪৪]মিলনঃ ২১শ বর্ষ পৃঃ ৩৪।

[১৪৫]মিলনঃ ২৬ বর্ষ পৃঃ ৮।

[১৪৬]একটি মেয়ের কাহিনি -ভাস্কর। মিলনঃ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ১৯

[১৪৭]দুই রাত্রি -হিন্দি সাহিত্যিক ভগবতী চরণ শর্মা। মিলনঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা পৃঃ ১৭।

[১৪৮]শেষ প্রশ্ন -প্রতাপাদিত্য দেব। মিলনঃ ২১শ বর্ষ পৃঃ১৯।

[১৪৯]মিলনঃ ১২শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা পৃঃ ২২।

[১৫০]মিলনঃ ২১ শ বর্ষ পৃঃ ৯।

[১৫১]মিলনঃ ২১শ বর্ষ পৃঃ ৩২।

[১৫২]মিলনঃ ২৬শ বর্ষ পৃঃ ৩১।